Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খালেদা আক্তার লাকি

রোলঃ 216022322

২৫ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খালেদা আক্তার লাকি

রোলঃ 216022322

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খালেদা আক্তার লাকি, আইডিঃ 216022322 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Khaleda Akter lucky

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

খালেদা আক্তার লাকি

আইডিঃ 216022322

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.রোজার ভূমিকা গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রোযা বা **রোজা** (ফার্সি روزه *রুজ়ে*), **সাউম** বা **সাওম** (আরবি صوم *স্বাউম্*, অর্থঃ সংযম), বা **সিয়াম** হলো ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়। সুবহে সাদেক বা ভোরের সূক্ষ্ম আলো থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার,পাপাচার, কামাচার এবং সেই সাথে যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকেও বিরত থাকার নাম রোযা। ইসলামী বিধান অনুসারে, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য রমযান মাসের প্রতি দিন রোজা রাখা ফরজ, (فرض *ফ্যর্দ্*) যার অর্থ অবশ্য পালনীয়।

বছরের বিভিন্ন সময়ে রোজা রাখলেও কেবল রমজান মাসের রোজা পালন করা ফরজ।

রোজা কেবল উম্মতে মুহাম্মাদ জন্য ফরজ নয়, বরং তা অতীত নবী-রাসুলদের উম্মতদের জন্যও ছিল। কিন্তু রোজার সময়, পদ্ধতি ও ধারা ভিন্ন ছিল।

রোজা ফারসি শব্দ, অর্থ উপবাস থাকা। কোরআন-হাদিসে এটিকে সিয়াম বলে। রোজা শব্দটিই প্রচলিত। সাওম বা সিয়াম শব্দের অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম, সিয়াম বা রোজা বলে।

কোরআন যে আয়াতটির মাধ্যমে রোজা ফরজ হয়, সেটিতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রোজা ফরজ

ছিল। আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের জন্য সিয়াম (রোজা) বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।

আদম (আ.)-এর সময় আইয়ামে বিজ বা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখতে হতো। 'আইয়ামে বিজ' অর্থ শুভ্রতার দিনসমূহ। আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে থাকাকালে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলায় তাঁদের গায়ের রং কালো হয়ে যায়। তাই ফেরেশতারা তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁরাও তওবা করেন। ফলে তাঁদের গায়ের রং সাদা ও সুন্দর হয়। এরপর আল্লাহ আদম (আ.) ও তাঁর উম্মতকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) আইয়ামে বিজের সিয়াম পালন করতেন।' (নাসায়ি)

নুহ (আ.)-এর যুগেও রোজা পালন করা হতো। মহানবী (সা.) বলেন, 'নুহ (আ.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ছাড়া গোটা বছর রোজা রাখতেন।' (ইবনে মাজাহ)। মহানবী (সা.) আরও বলেন, 'নুহ (আ.)-এর যুগ থেকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা ছিল।' (ইবনে কাসির)

রমজানের ছয়টি অভ্যাস :

মুসা (আ.)-এর উম্মতের জন্য আশুরার রোজা ফরজ ছিল। মহানবী (সা.) মদিনায় আসার পর ইহুদিদের আশুরার রোজা পালন করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল, 'এটি এক শুভ দিন। এই দিনে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে মুসা (আ.) আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওই দিনে রোজা রাখেন।' এ কথা শুনে মহানবী

(সা.) বলেন, 'তাহলে আমি হজরত মুসা (আ.)-এর অনুসরণে তোমাদের তুলনায় বেশি হকদার।' (বুখারি)। এরপর মহানবী (সা.) আশুরার রোজা রাখেন এবং সাহাবিদের রোজা রাখার নির্দেশ দেন। এরপর রমজানের রোজা ফরজ হলে আশুরার রোজা নফলে পরিণত হয়।

দাউদ (আ.) বছরে ছয় মাস রোজা রাখতেন আর ছয় মাস রোজা রাখতেন না। মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা হলো দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি এক দিন রোজা রাখতেন এবং এক দিন বিনা রোজায় অতিবাহিত করতেন।'

একজন রোজাদারের রোজা কেমন হতে পারে

রমজানের রোজা পালন ফরজ করে আল্লাহ বলেন, রমজান মাস, এতে মানুষের পথপ্রদর্শক ও সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসারূপে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব, তোমাদের মধ্যে য কেউ এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোজা রাখে। আর যে রোগী বা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, যাতে তোমরা নির্ধারিত দিন পূর্ণ করতে পার ও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে পার, আর তোমরা কৃতজ্ঞ হলেও হতে পার। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

আয়াতটি দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়। তারপর ফরজ রোজা চালু হয়।

রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার ইতিহাস

রোজার ইতিহাস দীর্ঘতর। আগেকার উম্মতরাও যে রোজা পালন করতেন এবং তাদের ওপরও যে রোজা ফরজ ছিল, তা কোরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন রোজা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা পরহেজগার তথা খোদাভীরু হতে পার।' (সূরা বাকারা : ১৮৩)।

তাফসীরে হক্কানীতে তওরাত তথা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের ওপর সপ্তম মাসের ১০ তারিখে কাফফারার রোজা রাখা ওয়াজিব ছিল। প্রাচীন খ্রিষ্টানরাও সেই রোজা রাখত বলে প্রকাশ আছে। হযরত মুসা আ. তুর পর্বতে ৪০ দিন রোজা রেখেছেন। হযরত দানিয়াল আ. একাধারে তিন সপ্তাহ রোজা পালন করেছেন। বাইবেল হতে প্রতীয়মান হয়, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা এছাড়া আরো রোজা রাখত। বর্তমান যুগেও তাদের ধর্মপরায়ণ লোকেরা বছরের বিভিন্ন সময়ে রোজা পালন করে আসছে।পূর্বেকার শরীয়তসমূহে রমজান মাসের ৩০টি রোজা ফরজ ছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর রমজান মাসের রোজা ফরজ ছিল। কিন্তু খ্রিষ্টানরা তাতে দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। প্রথমত, কষ্টের ভয়ে তারা গ্রীষ্মের পরিবর্তে

শরৎকালে রোজা রাখত। দ্বিতীয়ত, এই ত্রুটি পূরণের জন্যে ত্রিশের অধিক রোজা রাখত। তবে অন্যরা বলেন, রোজা শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যই ফরজ করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তের রোজা ফরজ হওয়া সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের ওপর ১০ মুহাররমের রোজা ফরজ ছিল। অতঃপর রমজানের রোজার হুকুম নাজিল হলে উক্ত রোজার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে মুসনাদে আহমদ থেকে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এই রেওয়াতে বলা হয়েছে, ইসলামের শুরুতে রোজা তিনটি স্তর অতিক্রম করে। এক. রাসূল হিজরত করে মদীনায় গমন করলে তিনি প্রতিমাসে তিনটি করে রোজা রাখতেন। তার সাথে আশুরার রোজাও পালন করতেন। অতঃপর রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়। দুই. রমজান মাসের রোজার হুকুম এলে প্রথম দিকে মুসলমানদের এখতিয়ার দেয়া হয় যে, যার ইচ্ছা রাখবে এবং যার ইচ্ছা ফিদিয়া দিবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা রমজান মাসকে পায়, তারা অবশ্যই রোজা রাখবে।' (সূরা বাকারা : ১৮৫)। এই আদেশের ফলে মুসাফির ও পীড়িত নয়, এমন প্রত্যেক নর-নারীর ওপর রোজা পালন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

তবে যারা চরম বার্ধক্যে উপনীত, তাদেরকে প্রতি রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তিন. ইতোপূর্বে রাতে শোয়ার পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ছিল। শুয়ে পড়লে এ সকল ধরনের কাজ নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর কোরআনের অপর

আয়াত মতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এসব কাজের অনুমতি দেয়া হয় এবং সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পালনের আদেশ আসে।

রোজা কোন মাসে ফরজ হয়েছিল, এই সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে বলেন, হিজরী দ্বিতীয় সনে শাবান মাসে বদর যুদ্ধের আগে রমজানের রোজা ফরজ করা হয়। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বাননুরী রহ. বলেন, হিজরি দ্বিতীয় সনের ১০ শাবান রোজা ফরজ করা হয় এবং উক্ত সনেই কেবলা পরিবর্তনসহ যাকাত-ফিতরার হুকুম অবতীর্ণ হয়।

রোজা ফরজ হওয়ার দলিল :

রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারীতা (তাকওয়া) অর্জন করতে পার"। (সূরা বাকারাঃ ১৮৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসের রোজা রাখে"। (সূরা বাকারাঃ ১৮৫) জনৈক গ্রাম্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ আমাকে বলুনঃ আল্লাহ আমার উপর রোজা থেকে কি ফরজ করেছেন?

উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

(شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا)

"তোমার উপর রামাযান মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে। তবে তুমি এর চেয়ে বেশী নফল রোজা রাখতে পার"।[1]

২.রোজার শর্ত কি :

রোজার কিছু মৌলিক আচার আছে। যা ফরজ বলে চিহ্নিত। সুস্থ-সবল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। কিন্তু শারীরিক অসমর্থতার কারণে সে এ দায়িত্ব থেকে আপাতভাবে মুক্তি পেতে পারে। এর প্রতিবিধানে রয়েছে কাজা ও কাফফারার বিধান। নিচে রোজার ফরজ ও শর্তগুলো দেওয়া হলো-

রোজার ৩ ফরজ :

- নিয়ত করা
- সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকা
- যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকা।

রোজা রাখার ৪ শর্ত :

- মুসলিম হওয়া
- বালেগ হওয়া
- অক্ষম না হওয়া
- ঋতুস্রাব থেকে বিরত থাকা নারী

রোজা বা সিয়াম ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির একটি। দ্বিতীয় হিজরিতে রোজা মুসলমানদের ওপর ফরজ হয়েছে। রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত যাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে, তাদেরকে রোজা রাখতে হবে। কারণ, তাদের জন্য রোজা রাখা ফরজ বা আবশ্যক কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা এই (রমজান) মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে রোজা পালন করে। (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)। রোজা ফরজ হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

রোজা ফরজ হওয়ার শর্তগুলো-

১. মুসলিম হওয়া। অমুসলিমের ওপর রোজার বিধান নেই।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোজা ফরজ নয়।

৩. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত (পাগল) কারো ওপর রোজা ফরজ নয়।

৪. হায়েয তথা ঋতুকাল এবং নেফাস তথা সন্তান জন্মদান পরবর্তী সময়ে পবিত্র থাকা। মহিলাদের হায়েজ ও নেফাসের সময়ে রোজা রাখা যাবে না। হায়েজ-নেফাসের কারণে যে কয়টা রোজা ভঙ্গ হবে, তা পরবর্তীতে কাজা করে নিতে হবে।

৫. রোজা পালন সামর্থবান হওয়া।

৬. মুসাফির না হওয়া। কারণ, মুসাফিরের জন্য রোজা ফরজ নয়। পরবর্তীতে কাজা করে নিতে হবে।

যারা রোজা পালনের শর্তগুলোর আওতায় থাকবে; তাদের জন্য রোজা পালন করা আবশ্যক।

৩.রোজার প্রকারভেদ :

ইসলামের বিধি অনুযায়ী রোজা ৪ প্রকার। যেমন : ১. ফরজ ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নত ৪.নফল।

না বোধক রোজা দুই প্রকার। যেমন : ১. মাকরূহ ও ২. হারাম।

ফরজ রোজা : রমজানের রোজা ফরজ। মান্নত ও কাফ্ফারার রোজা ওয়াজিব।

সুন্নত রোজা : নবী করীম সা: নিজে যে রোজা পালন করেছেন এবং উম্মতকেও পালন করতে বলেছেন, সেটাই সুন্নত রোজা। এর মধ্যে রয়েছে- ১. আশুরার রোজা, মহররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখ ২. আরাফার দিনের রোজা, ৩. আইয়্যামে বীজের রোজা। অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজ।

নফল রোজা : উপরোক্ত তিন প্রকার বাদে বাকি সব ইতিবাচক রোজাই নফল রোজা। যেমনÑ শাওয়াল মাসের ছয়টি ও অন্যান্য রোজা।

মাকরুহ রোজা : শুধু শনিবার কিংবা রোববার রোজা পালন করা মাকরুহ। আশুরার দিনে শুধু একটি রোজা মাকরুহ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীর নফল রোজা মাকরুহ.।হারাম রোজা : বছরের পাঁচ দিন রোজা পালন করা হারাম। ১. ঈদুল ফিতরের দিন, ২. ঈদুল আজহার দিন, ৩. আইয়্যামে তাশরিকের দিনসমূহ অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ জিলহজ।

যারা রমজান মাসে রোজা ভাঙতে পারেন :

১. রোগগ্রস্ত : কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে রোগগ্রস্ত হলে রোজা ভাঙতে পারেন। তবে পরে সেগুলো কাজা করতে হবে।

২. মুসাফির : কেউ যদি রমজান মাসে কসর নামাজ পড়ার দূরত্বে

সফর করেন, তবে তিনি রোজা ভাঙতে পারেন। তাকেও পরে কাজা করতে হবে।

৩. নিফাস ও ঋতুবতী : সন্তান প্রসবের পর এবং মাসিক চলাকালে মহিলারা রোজা ভাঙবে। তবে পরে কাজা করতে হবে।

৪. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী : বড় ধরনের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকলে মহিলারা রোজা ভাঙতে পারে এবং প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকিন খাওয়াতে হবে।

৫. অক্ষম : বৃদ্ধ বয়স বা এমন রোগাগ্রস্ত ব্যক্তি যার সুস্থ হয়ে ওঠার আশা নেই, এমন ব্যক্তিরা রোজা ভেঙে প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকিন খাওয়াতে পারে।

রমজান ও রোজা

রমজান মাস মুসলমানের জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। এ মাস কল্যাণ ও সৌভাগ্যপূর্ণ। এটি হচ্ছে নেক কাজের মৌসুম। এই মৌসুমে নেক কাজ করার সুযোগ অনেক বেশি। তাই একজন মোমিন নিজে ঈমান ও আমলকে উন্নত করার জন্য ১১ মাস অপেক্ষা করে। যারা বেশি বেশি নেক কাজ করে এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে, তারা কতই না সৌভাগ্যবান! পক্ষান্তরে, যারা এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে না, তারা অবশ্যই হতভাগ্য।

এক নজরে রমজান :

১. রমজান মাসের একটি নফল আদায় অন্য মাসের একটি ফরজ আদায়ের সমান (বায়হাকি)।

২. রমজান মাসে একটি ফরজ আদায় অন্য মাসে ৭০টি ফরজ আদায়ের সমান (বায়হাকি)।

৩. রমজান সবরের মাস, আর সবরের বিনিময় জান্নাত (বায়হাকি)।

৪. রমজান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস (বায়হাকি)।

৫. রমজান মাসে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি পায় (বায়হাকি)।

৬. রোজাদারকে ইফতার করালে সমান পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে অথচ রোজাদারের সওয়াব কাটা হবে না (বায়হাকি)।

৭. রোজাদারকে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ালে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসা লাগবে না।

৮. রমজানের প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাত এবং শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের।

৯. জান্নাতে ৮টি গেটের মধ্যে একটির নাম রাইয়ান, যে গেট দিয়ে রোজাদার ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না (বুখারি ও মুসলিম)।

১০. ঈমান ওআত্মসমালোচনার সাথে (নেকি লাভের আশায়) ইবাদত করলে আগের গুনাহখাতা মাফ হয়ে যাবে (বুখারি ও মুসলিম)।

১১. রোজাদারের জন্য দুটি সময় খুশিরÑ একটি হলো ইফতার করার সময়, অন্যটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় (বুখারি ও মুসলিম)।

১২. রোজা সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ, আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির দাবি পূরণে বাধা দিয়েছি, তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বাধা দিয়েছি, তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন (বায়হাকি)।

১৩. রোজাদার ইফতার না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করতে থাকে।

১৪. এ মাসে শয়তানদের শিকল দিয়ে বাঁধা হয়।

১৫. রমজানের প্রতি রাতে রোজাদারদের মুক্তি দেয়া হয়।

১৬. রমজান মাস বেশি দান সাদকা করার মাস।

১৭. রমজান মাস কুরআন নাজিলের মাস।

১৮. রমজান মাস কুরআন বিজয়ের মাস।

১৯. রমজান মাসের ওমরাহ একটি হজের সমান।

২০. রোজাদার ব্যক্তি শ্রমিকদের মতোই শেষ রমজানে পারিশ্রমিক লাভ করে।

২১. শাওয়ালের মাসের ৬টি নফল রোজা রাখলে পূর্ণ বছরের সওয়াব পাওয়া যায়।

২২. শেষ রাতের সাহরি (খাবার) বরকতময়।

২৩. তারাবিহ ও তাহাজ্জুদের কিয়াম দ্বারা অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৪. রোজা ত্রুটিমুক্ত করার জন্য ফিতরা আদায় করা হয়।

২৫. রমজানে শারীরিক রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়।

২৬. রোজা রাখলে নিন্দা গিবত চর্চা বন্ধ হয়ে যায়।

২৭. রমজানে তওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৮. রমজানে ক্ষুধা-পিপাসার ব্যথা অনুভবে মমত্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

২৯. রমজানের রোজার পুরস্কার আল্লাহ তায়ালা ঈদের দিনে দিয়ে খুশি করেন।

৩০. সমুদ্রের মাছও রোজাদারের জন্য দোয়া করে।

৩১. রমজানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়।

রোজা পাঁচ প্রকার।

- ফরজ রোজা: যা আবার চার প্রকার-
    - রমজান মাসের রোজা।
    - কোন কারণ বশত রমজানের রোজা ভঙ্গ হয়ে গেলে তার কাযা আদায়ে রোজা।
    - শরীয়তে স্বীকৃত কারণ ব্যতীত রমজানের রোজা ছেড়ে দিলে কাফফারা হিসেবে ৬০টি রোজা রাখা।
    - রোজার মান্নত করলে তা আদায় করা।
- ওয়াজিব রোজা: নফল রোজা রেখে ভঙ্গ করলে পরবর্তীতে তা আদায় করা ওয়াজিব।
- সুন্নত রোজা: মহরম মাসের নয় এবং দশ তারিখে রোজা রাখা।
- মুস্তাহাব রোজা: প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, এবং ১৫ তারিখে, প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারে, কোন কোন ইমামের মতে শাওয়াল মাসে পৃথক পৃথক প্রতি সপ্তাহে দুটো করে ছয়টি রোজা রাখা মোস্তাহাব। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এক সাথে হোক কিংবা পৃথক পৃথক হোক শাওয়ালের ছয়টি রোজা মুস্তাহাব।
- নফল রোজা: মোস্তাহাব আর নফল খুব কাছাকাছির ইবাদত। সহজ অর্থে নফল হলো যা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত নয় এমন ইবাদত পূণ্যের নিয়তে করা। রোজার ক্ষেত্রেও তাই। [১৪]

৪.রোজা ভঙ্গের কারণ

রোজা পবিত্র রমজানের গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান। তাই রোজা রাখার পর সতর্ক থাকতে হয় যেন এমন কিছু না হয়, যেটার কারণে রোজা ভেঙে যায়। প্রথমত ও সাধারণত তিনটি কারণে রোজা ভেঙে যায়। সেগুলো হলো- খাওয়া, পান করা ও স্ত্রী-সম্পর্ক।

তবে এগুলো ছাড়াও কিছু কারণে রোজা ভেঙে যায়। যেগুলো জেনে রাখা প্রত্যেক রোজাদারের জন্য জরুরি। সংক্ষেপে সেসব কারণ হলো—

১. ইচ্ছা করে বমি করা

২. বমির বেশির ভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেলা

৩. মেয়েদের মাসিক ও সন্তান প্রসবের পর ঋতুস্রাব

৪. ইসলাম ত্যাগ করলে

৫. গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন বা সেলাইন দিলে

৬. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু শরীরে প্রবেশ করালে

৭. রোজাদারকে জোর করে কেউ কিছু খাওয়ালে

৮. ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে

৯. মুখ ভরে বমি করলে

১০. ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে, রোজা ভেঙে গেছে ভেবে ইচ্ছা করে আরও কিছু খেলে

১১. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর তা খেয়ে ফেললে

১২. কান বা নাক দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে

১৩. জিহ্বা দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু বের করে খেয়ে ফেললে

১৪. অল্প বমি মুখে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা গিলে ফেললে

১৫. রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় অজুতে কুলি বা নাকে পানি দেয়ার সময় ভেতরে পানি চলে গেলে।

৫.যেসব কারণে রোজা মাকরূহ হয় :

রোজার পূর্ণতার জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অন্যান্য ফরজ, সুন্নত ও নফল ইবাদত ঠিকমতো আদায় করা আবশ্যক। একই সঙ্গে অশ্লীল ও অহেতুক কাজ পরিহার করা জরুরি। >> রোজাদারের জন্য মিথ্যা বলা, গিবত করা, অশ্লীল কাজ করা, অশ্লীল কথা বলা, গালিগালাজ করা, গান শুনা, সিনেমা, ভিডিও দেখা মাকরুহ।

*বিনা ওজরে কোনো জিনিস মুখে দিয়ে চিবানো।

*গরমের কারণে বারবার কুলি করা।

*টুথ পাউডার, পেস্ট, কয়লা বা অন্য কোনো মাজন দ্বারা রোজার দিনে দাঁত পরিষ্কার করা।

*বিনা ওজরে জিহ্বা দ্বারা কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা। তবে বদমেজাজি স্বামীর জন্য স্ত্রীর তরকারির স্বাদ গ্রহণ করার অনুমতি আছে।

*রোজাদার অবস্থায় কারও গিবত (পরচর্চা, পরনিন্দা) করা।

*মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

*অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা কিংবা পাঠ করা।

*ঝগড়া-বিবাদ করা।

৬.রোজা ভঙ্গ হলে করণীয় :

বিনা কারণে রোজা ভঙ্গ করলে তাকে অবশ্যই কাজা-কাফফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব। যতটি রোজা ভঙ্গ হবে, ততটি রোজা আদায় করতে হবে। কাজা রোজা একটির পরিবর্তে একটি অর্থাৎ রোজার কাজা হিসেবে শুধু একটি রোজাই যথেষ্ট। কাফফারা আদায় করার তিনটি বিধান রয়েছে।

- একটি রোজা ভঙ্গের জন্য একাধারে ৬০টি রোজা রাখতে হবে। কাফফারা ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজার মাঝে কোনো একটি ভঙ্গ হলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।
- যদি কারও জন্য ৬০টি রোজা পালন সম্ভব না হয় তবে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়াতে হবে। কেউ অসুস্থতাজনিত কারণে রোজা রাখার ক্ষমতা না থাকলে ৬০ জন ফকির, মিসকিন, গরিব বা অসহায়কে প্রতিদিন দুই বেলা করে পেটভরে খাওয়াতে হবে।
- গোলাম বা দাসী আজাদ করে দিতে হবে।

যেসব কারণে রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করা যাবে কিন্তু পরে কাজা করতে হয় তা হচ্ছে

- মুসাফির অবস্থায়
- রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধির বেশি আশঙ্কা থাকলে
- মাতৃগর্ভে সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে
- এমন ক্ষুধা বা তৃষ্ণা হয়, যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকতে পারে
- শক্তিহীন বৃদ্ধ হলে
- কোনো রোজাদারকে সাপে দংশন করলে।

- মহিলাদের মাসিক হায়েজ-নেফাসকালীন রোজা ভঙ্গ করা যায়

যেসব কারণে শুধু কাজা আদায় করতে হয়

- স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করার কারণে যদি বীর্যপাত হয়
- ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে
- পাথরের কণা, লোহার টুকরা, ফলের বিচি গিলে ফেললে
- ডুশ গ্রহণ করলে
- বিন্দু পরিমাণ কোন খাবার খেলে তবে অনিচ্ছাকৃত ভাবে বা মনের ভুলে খেলেও রোজা ভাংবে না তবে মনে আসা মাত্রই খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে
- নাকে বা কানে ওষুধ দিলে (যদি তা পেটে পৌঁছে)
- মাথার ক্ষতস্থানে ওষুধ দেওয়ার পর তা যদি মস্তিষ্কে বা পেটে পৌঁছে
- যোনিপথ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সহবাস করার ফলে বীর্য নির্গত হলে

৭.রোজার কাযা ও কাফফারা :

যে কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং তার প্রতিবিধান হিসেবে কাজা ও কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) উভয়টি আদায় করতে হয়। তা হলো স্ত্রী সম্ভোগ ও ইচ্ছাকৃত পানাহার। কেউ যদি ইচ্ছা করে রমজান মাসে দিনের বেলা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে অথবা পানাহার করে, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে। তার প্রতিবিধান হিসেবে ব্যক্তিকে রোজার কাজা ও কাফফারা করতে হবে।তবে ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (রহ.)-এর মত হলো কেউ ইচ্ছা করে কিছু খেলে শুধু কাজা করবে। কাফফারা দিতে হবে না। তাঁদের মতে, শুধু স্ত্রী সম্ভোগের কারণেই রোজার কাফফারা

ওয়াজিব হয়।উল্লেখ্য, ওষুধ ও ধূমপান পানাহারের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বেচ্ছায় যেকোনো প্রকার বীর্যপাত স্ত্রী সংগমের অন্তর্ভুক্ত। কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসে বাধ্য করে তবে স্ত্রী শুধু রোজা কাজা করবে এবং স্বামীর কাজা-কাফফারা দুটিই করবে।

দুই. যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে প্রতিবিধান হিসেবে শুধু কাজা করতে হয়, কাফফারা দিতে হয় না। এমন কিছু কারণ হলো—১. ইচ্ছা করে বমি করা, ২. বমির বেশির ভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেলা, ৩. মেয়েদের মাসিক ও সন্তান প্রসবের পর ঋতুস্রাব, ৪. ইসলাম ত্যাগ করলে, ৫. গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন বা সেলাইন দিলে, ৬. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় গলার ভেতর পানি প্রবেশ করলে, ৭. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু শরীরে প্রবেশ করালে, ৮. রোজাদারকে জোর করে কেউ কিছু খাওয়ালে, ৯. রাত অবশিষ্ট আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর পানাহার করলে, ১০. ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে, ১১. মুখ ভরেবমি করলে, ১২. ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে, রোজা ভেঙে গেছে ভেবে ইচ্ছা করে আরো কিছু খেলে, ১৩. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর তা খেয়ে ফেললে, ১৪. কান বা নাক দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে, ১৫. জিহ্বা দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু বের করে খেয়ে ফেললে, ১৬. অল্প বমি মুখে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা গিলে ফেললে, ১৭. রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় অজুতে কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার সময় ভেতরে পানি চলে গেলে

রোজা রেখে কোনো ওজরের কারণে ভেঙে ফেললে তা পরে কাজা আদায় করতে হয়। কাজা হলো একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা। কাজা রোজা পরবর্তীকালে সুবিধামতো সময়ে আদায় করা যায়, সব কাজা রোজা একত্রে আদায় করা জরুরি নয়।

রোজা রেখে ওজর ছাড়া কোনোরূপ শয়তানি ধোঁকায় বা নফসের তাড়নায় তা ভঙ্গ করলে এর জন্য কাজা ও কাফফারা উভয় আদায় করতে হয়। কাফফারা তিনভাবে আদায় করা যায়। একটি দাসমুক্ত করা, ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা ভালোভাবে তৃপ্তিসহকারে আহার করানো এবং ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজা পালন করা।

যে কয়টি রোজা রাখার পর ওজর ছাড়া ভাঙবে, ততটির প্রতিটির পরিবর্তে একটি করে কাজা এবং একই রমজান মাসের জন্য তার সঙ্গে যুক্ত হবে একটি কাফফারা। অর্থাৎ একটি রোজা যৌক্তিক কারণ ছাড়া ভাঙলে তার জন্য কাজা ও কাফফারা হবে ৬১ রোজা, দুটি ভাঙলে হবে ৬২ রোজা, তিনটি ভাঙলে হবে ৬৩ রোজা।

কাফফারা ৬০টি রোজা একত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আদায় করতে হয়। কারও যদি কাজা, কাফফারাসহ মোট ৬১ বা তার বেশি হয়, তবে কমপক্ষে ৬১টি রোজা একটানা আদায় করতে হবে। কাফফারার রোজার মধ্যে বিরতি হলে বা ভাঙলে আরেকটি কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ ৬১টি রোজা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিরতি হলে পুনরায় নতুন করে এক থেকে শুরু করে ৬১টি পূর্ণ করতে হবে। যে রোজাগুলো রাখা হলো তা নফল হিসেবে পরিগণিত

হবে। কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর বা আপদের কারণে ভাঙতে হলে তা ক্ষমার্হ। মহিলারা বিশেষ বিরতির সময় বাদ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে আদায় করবে।

শিশু নাবালেগ অবস্থায় (সাধারণত মেয়েদের ১১ বছরের পূর্বে ও ছেলেদের ১৩ বছরের পূর্বে) রোজা রাখা ফরজ নয়, তবু তারা নিজেদের আগ্রহে ও বড়দের উৎসাহে রোজা রেখে থাকে। এ অবস্থায় তারা যদি রোজা রেখে কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেকোনোভাবে রোজা ভেঙে ফেলে, তাহলে তাদের এ রোজার কাজা বা কাফফারা কোনোটিই প্রয়োজন হবে না।

৮.রোজার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও যৌক্তিকতা :

রোজা রাখার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরহেজগারি বা তাকওয়া বৃদ্ধি করা। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো" ।এটা কি করে হতে পারে যে, রোযাদার তার প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে, অথচ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলবে? নিজের রোযায় আন্তরিকতা রাখবে, অথচ নিজ সমাজের সঙ্গে ধোকাবাজী ও কপটতা প্রদর্শন করবে? ইখলাস ও আন্তরিকতা একটি সামগ্রিক বস্তু; যা ভাগাভাগি হয় না। যার সর্বোচ্চ পর্যায় ও সারাংশ হল সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামী আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। সুতরাং যে ব্যক্তির আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা থাকবে, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব যে, সে মানুষকে ধোকা দেবে, আমানতে খেয়ানত করবে, অপরকে ঠকিয়ে খাবে, চুরি করবে, যুলম করবে অথবা অপরকে কষ্ট দেবে। পক্ষান্তরে যদি কারো চক্রান্তে পড়ে বা

ভুলক্রমে এ ধরনের কোন পাপ করেই বসে, তাহলে সাথে সাথে সে সুপথে ফিরে আসে, আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয় সীমাহীন।

সুতরাং রোযা হল একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুচরিত্র গঠনের উপকরণ এবং তা সমৃদ্ধকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ এক মৌলিক উপাদান। আর বিদিত যে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাহার কোন মূল্য রাখে না; যদি না অভ্যন্তর সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই রোযাদারের জীবনে তার আখলাক-চরিত্র স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, বর্ধনশীলতা ও শ্রীবৃদ্ধিশীলতার গুণাবলী গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তার সকল আচরণ ভিতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়।

৪। রোযা রোযাদারের আচার-ব্যবহারকে সুন্দর করার কাজে বড় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্ণ একটি মাস ধরে তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে নিরাপদে রাখে। বরং রোযা তাকে এক মহান ইবাদতে মশগুল রাখে, হীনতা ও নীচতা হতে রক্ষা করে, প্রত্যেক নোংরামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সুতরাং সে না চুগলী করে, না গীবত। না মিথ্যা বলে, না অশ্লীল। না ফিতনা সৃষ্টি করে, না ফাসাদ। না অসার বকে, না ফালতু। কোন প্রকারের পাপাচরণ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। ফলে প্রকৃত রোযাদার রোযার পরেও একটি নিষ্পাপ ও পবিত্র মানুষের মত যাবতীয় সচ্চরিত্রতার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সুখময় জীবন-যাপন করতে পারে।[3]

৫। রোযা মন ও প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন দেয়। জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে রোযাদার তার মন ও প্রবৃত্তিকে সেই কাজে ব্যবহার করতে পারে; যাতে ইহ-পারলৌকিক সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে। আর এমন আচরণ ও কর্ম থেকে তাকে দূরে রাখে; যাতে সে একটি ইন্দ্রিয়সেবী ও পাশবিক গুণসম্পন্ন মানুষ বলে

পরিচিত হতে পারে; যেখানে সে কামনা-বাসনা ও লালসার প্রবণতা থেকে তাকে রুখতে সক্ষম হয় না।

সুতরাং রোযা সেই মন্দপ্রবণ আত্মার বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিজয়ী হতে মুসলিমকে সার্বিক সহযোগিতা করে, যে আত্মা সর্বদা হারাম কাজে লিপ্ত হতে চায়, অবৈধভাবে কাম-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। রোযা রোযাদারের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুপ্রবৃত্তির স্পর্শ থেকে দূরে থাকার ‘ট্রেনিং’ দেয়। রোযার মাঝে রয়েছে আত্মসংযম এবং কুপ্রবৃত্তির দমন। আধুনিক যুগের মানুষ অধিকাংশে নিজ কামনা-বাসনার কাছে বড় দুর্বল, কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ-প্রবণ খেয়ালখুশীর বশীভূত। আর মনকে সবল ও সুদৃঢ় করতে রোযা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। কারণ, রোযাদার অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থাকা সত্ত্বেও পানাহার বর্জন করে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এ কাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বকাজে মনোবল প্রবল ও সুদৃঢ় হয়।

৬। রোযা রোযাদারকে কুঅভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করে। এমন বহু মানুষ আছে, যারা এমন বহু নোংরা অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে পড়ে এবং তার ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু রোযা এলে তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা তাদের সে সমস্ত কুঅভ্যাসকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলেছে।

৭। রোযার মাঝে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখার সবিশেষ প্রশিক্ষণ। কারণ, রোযা হল গুপ্ত ইবাদত। যেহেতু মানুষ এ ইবাদতে মুনাফেকী রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলে সে গোপনে খেতে বা পান করতে পারে, অথবা উপবাস থেকেও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সুতরাং নিছক আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও সত্য ভয় না থাকলে প্রকৃতরূপে রোযা রাখা যায় না।

বলা বাহুল্য, রোযা হল এমন একটি আন্তরিক ইবাদত, যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে একান্ত গুপ্ত। অতএব গোপনে পানাহার করার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে বান্দা নিঃসন্দেহে এই বলে অটল বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তার গোপন সব কিছুই দেখেন ও জানেন। আর এখান থেকেই রোযাদারের মনে ইবাদতে সততা ও আমানতদারী সৃষ্টি হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা রোযাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন; বান্দার প্রত্যেক আমলের সওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ; বরং আরো অনেক অনেক গুণ বর্ধিত করে থাকেন। কিন্তু রোযা নয়। রোযাকে তিনি নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। আর তার সওয়াবের পরিমাণ যে কত, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তাতে তার সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোযা নয়। রোযা হল আমার জন্য। আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।’’

৮। রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। কারণ, সে আল্লাহর নিকট আখেরাতে যে সওয়াব ও প্রতিদান আছে তা পাওয়ার আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে পার্থিব কিছু সুখ-উপভোগ থেকে বিরত থাকে। সে যে নিক্তিতে লাভ-নোকসান ওজন করে থাকে তা হল পারলৌকিক। রোযার দিনে পানাহার ও যৌনসুখ শুধু এই আশায় পরিহার করে যে, এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার সাথে সাথে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান পাবে। সুতরাং এইভাবে রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি ঈমান বদ্ধমূল করে, পরলোকের সাথে অন্তরকে জুড়ে রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী এই ধরাধামের পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে; যে ভোগ-বিলাস অনেক সময় মানুষকে আখেরাতের কথা বিস্মৃত করে এই ধারণা দেয় যে, সে পৃথিবীতে অমর ও চিরকাল থাকবে।

৯। রোযা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করার কথা শিক্ষা দেয়। রোযা মুসলিমকে প্রকৃত দাসত্বের অনুশীলন দেয়। তাই তো সে রাতের বেলায় খায়, পান করে। কারণ, তার প্রভু যে বলেছেন,

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

বলা বাহুল্য, এ জন্যই ইফতার ও সেহরীর সময় খাওয়া হল সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং না খেয়ে একটানা পরপর কয়েকদিন রোযা রাখা মকরূহ। অতএব রোযা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া এবং রোযার শেষে ইফতারী খাওয়া হল এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশের আনুগত্য।

তদনুরূপ ফজর উদয় হলে মুসলিম পানাহার সহ সেই সকল বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকে, যাতে রোযা নষ্ট করে ফেলে। আর এর মাঝেও সে একমাত্র আল্লাহরই দাত্ব ও আনুগত্য করে। কারণ, তিনি বলেন,

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

সুতরাং এইভাবে মুসলিম মহান আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে।[৪]

১০। রোযা মুসলিমের জন্য আল্লাহর এক প্রকার রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শন করেই রোযা ফরয করেছেন। কারণ, এরই

মাধ্যমে তিনি মুসলিমের পাপরাশি মার্জনা করে থাকেন, তার মর্যাদা উন্নীত করে থাকেন এবং বহুগুণ হারে তার সওয়াব বৃদ্ধি করে থাকেন।

১১। রোযা হল গোনাহের কাফ্ফারা। কারণ, নেকীর কাজ গোনাহর কাজের গোনাহ নাশ করে দেয়। আর রোযা হল বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات)

অর্থাৎ, নিশ্চয় পুণ্যরাশি (সওয়াবের কাজ) পাপরাশিকে দূরীভূত করে। (কুরআনুল কারীম ১১/১১৪)

আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত পাপরাশিকে নামায, রোযা এবং সদকাহ মোচন করে দেয়।''[10] অর্থাৎ, মুসলিম যে গোনাহ তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে উচ্চবাচ্য করে, কষ্ট দিয়ে অথবা কোন বিষয়ে তাদের প্রতি ক্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা প্রতিবেশীকে কোন কথায় বা কাজে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে, অথবা আর্থিক কোন প্রকার ক্রুটি ঘটিয়ে অথবা অনুরূপ অন্যান্য সাগীরা (ছোট) গোনাহ করে থাকে, সে সবকে তার নামায, রোযা এবং দান-খয়রাত মোচন করে দেয়।

পরন্তু প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা রেখে রমাযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।''আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ এবং এক রমাযান থেকে অন্য রমাযান -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)

পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার উপর নিজেদের কর্তব্যের বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, রোযা দেহ-মনের জন্য একটি বড় রহমত।

রোযার মাঝেই হৃদয় ও সকল চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত থাকে। সকল মনোবল তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর পথে জিহাদের কাজে বর্ধিত ও সংবদ্ধ হয়ে থাকে। যার পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, আল্লাহর বাণীই সমুন্নত হোক এবং কাফেরদের বাণী হোক অবনত; সে কাফের যেমনই হোক, তার যে নাম বা উপাধি হোক অথবা যে প্রতীকই হোক

১২। রোযা হল ঢালস্বরূপ; দোযখ থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ। একটি মাত্র রোযা জাহান্নামকে রোযাদার থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেয়.সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান মাসের রোযা রাখে এবং প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা অথবা আরো অন্যান্য নফল রোযা রাখে, সে ব্যক্তি থেকে দোযখ কত বছরের পথ দূরে সরে যায় তা অনুমেয়।

১৩। রোযা হল চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচার ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ঢালস্বরূপ। রোযা রোযাদারকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হিফাযতে রাখে, যেমন ঢাল মুজাহিদ (যোদ্ধা)কে শত্রুপক্ষের তীর ও তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, “হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনক্ষুধা উপশমকারী।”[15]

বলা বাহুল্য, যে যুবক বিবাহের খরচাদি বহন করতে সক্ষম নয়, সে যুবককে মহানবী এই নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তার কামক্ষুধা ও যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত করতে রোযার সাহায্য

নেয়। কারণ, রোযা উক্ত ক্ষুধা ও উত্তেজনা দমন ও নিবারণ করে। আর অনেকের অভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত নববী চিকিৎসা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত যে, কামপীড়িত যুবকের জন্য যে কোনও সেব্য ঔষধ অপেক্ষা রোযাই হল উত্তম ও অব্যর্থ ঔষধ।

১৪। রোযা হল বেহেশ্তেগামী পথ। আবূ উমামাহ (রাঃ) জান্নাতে প্রবেশ করাবে এমন আমল প্রসঙ্গে যখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নির্দেশ চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ''তুমি রোযা রাখ। কারণ, তার মত অন্য কোন আমল নেই।''[16] তাছাড়া মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রোযাদারকে বেহেশ্তে 'রাইয়ান' নামক এক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন।আর 'রাইয়ান' (তৃষ্ণাহীন) দ্বার আমল অনুযায়ী রোযাদারের জন্য বড় উপযুক্ত। কারণ, রোযা রাখার ফলে দুনিয়াতে সে পিপাসায় কাতর হয়। তাই তারই বিনিময়ে পরকালে ''সেই দ্বারে যে প্রবেশ করবে সে (বেহেস্তী পানীয়) পান করবে। আর যে ব্যক্তি একবার তা পান করবে, সে ব্যক্তি আর কোন কালেও পিপাসিত হবে না।''[18]

১৫। রোযা পালনের মাধ্যমে রোযাদার তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। যার জন্য তার উপবাস-জনিত মুখের দুর্গন্ধও আল্লাহর নিকট কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময় হয়![19] অথচ খালি পেটে থাকা অবস্থায় মুখ থেকে বের হওয়া ঐ দুর্গন্ধ কোন মানুষ পছন্দ করে না; বরং ঘৃণাই করে থাকে। কিন্তু তা মহান স্রষ্টার নিকটে অতি পছন্দনীয়। কারণ, এ গন্ধ তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে নির্গত হয়ে থাকে।

রোযা মানুষের হৃদয়কে নরম করে, আল্লাহ-প্রেমী করে এবং সর্বদা তাঁর যিক্র ও শুক্র করতে অভ্যাসী করে।

১৬। রোযা মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ ও প্রবাহ-পথ রুদ্ধ করে। এর ফলে তার দেহ-মনে শয়তানের আধিপত্য কমে যায়। পক্ষান্তরে যখনই মানুষ নিজ প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, তখনই শয়তান তা লুফে নিয়ে তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালিত করতে থাকে।

১৭। রোযা হল আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, রোযা হল পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার নাম। আর মানুষের উপর আল্লাহর যে সকল বড় বড় নেয়ামত রয়েছে তার মধ্যে পানাহার ও যৌনমিলন হল অন্যতম। সুতরাং মানুষ এ নেয়ামতের কদর তখনই বুঝবে, যখন সে এ নেয়ামত থেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে। কারণ, হারিয়ে না গেলে কোন নেয়ামতের কদর বুঝা যায় না। আর যখনই উক্ত নেয়ামতের কদর সে বুঝবে, তখনই তার অবশিষ্ট অধিকার আদায়ের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে। পক্ষান্তরে নেয়ামতের শুক্র আদায় করা ফরয; শরীয়তে এবং বিবেক মতেও।

১৮। রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষুধা-জনিত দুর্বলতার ফলে সে আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী তা আন্দাজ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিজের মাঝে নিজের দুর্বলতা চিনতে পারে, সে ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার দূরীভূত হয়ে যায়। পরন্তু আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে নিজের কদর নিজে জেনেছে।

১৯। রোযাতে রোযাদার ফিরিশ্তামন্ডলীর অনুরূপ কর্মে শামিল হতে পারে; যে ফিরিশ্তামন্ডলী আল্লাহর কোন প্রকার অবাধ্যাচরণ করেন না। তাঁরা তাই করেন, যা করতে তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে আদেশ করেন। দিবারাত্র তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ করেন না। যাঁরা খান না এবং পানও করেন না।

২০। রোযা রোযাদারের ঈমান বৃদ্ধি করে। এই রোযাতে মানুষ অধিকাধিক নামায পড়ে, কুরআন তেলাঅত ও যিক্র করে, দান-খয়রাত করে, দুআ ও ইস্তিগফার তথা তওবা করে,

ওয়ায-নসীহত শোনে। রোযা তাকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, এ সবে পাপ বন্ধ থাকে এবং ঈমান বর্ধিত হয়।

৯.রোজার ফরজ, ওয়াজিব, ও নফল গুলো কি কি

রমজানের ফরজ:

রমজান মাসের ফরজ আমল হলো একটি; এক মাস রোজা পালন করা। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূববর্তীদের ওপর; যাতে করে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো' (সুরা বাকারা)। প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন, শারীরিকভাবে রোজা পালনে সক্ষম মুসলমানের প্রতি রোজা ফরজ।

রমজানের ওয়াজিবসমূহ:

রমজানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়াজিব দুটি, যথা: সদকাতুল ফিতর আদায় করা ও ঈদের সালাত পড়া। ঈদের দিন সকালে যিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বা অধিকারী থাকবেন তিনি তার নিজের ও পরিবারের সকল সদস্যদের ফিতরা আদায় করবেন। যদি কেউ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নাও থাকেন তবুও সুন্নত বা নফল হিসেবে হলেও সদকাতুল ফিতর প্রদান করা উত্তম। সাহাবি হজরত আবুসাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসুল (স.) এর জমানায় আমরা ঈদের দিনে এক সা পরিমাণ খাদ্য পণ্য সদকাতুল ফিতর হিসেবে প্রদান করতাম। তিনি আরও বলেন, তখন আমাদের খাদ্যপণ্য ছিল যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুর (বুখারি শরিফ)।

রমজানের সুন্নতসমূহ:

রমজান মাসে বিশেষ কিছু সুন্নত রয়েছে, যথা: বিশ রাকাত তারাবিহ সালাত আদায় করা, সেহরি খাওয়া, তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা, ইফতার করা ও করানো, কোরআন করিম বেশি বেশি তিলাওয়াত করা এবং শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা। শেষ দশ দিনে বেজোড় রাতগুলোয় শবে কদর তালাশ করা এবং এই দোয়া পড়া—'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাফু আন্নী', অর্থ—হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন, (তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)।

বিশেষ নফল আমলসমূহ:

রমজানে প্রতিটি ইবাদতের বিনিময় সত্তরগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। একটি নফল পালন করলে একটি ফরজ পালন করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। তাই রমজান মাসে নফল ইবাদত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রমজান মাসের বিশেষ নফল আমলসমূহ হলো: কোরআন মাজিদ একাধিকবার খতম বা পূর্ণ পাঠ করা; কালিমা তৈয়্যবা বেশি বেশি পাঠ করা; দরুদ শরিফ বেশি বেশি পাঠ করা; তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকা; সর্বদা তসবি তাহলীল ও জিকির করতে থাকা; দীনী শিক্ষা ও দীনী দাওয়াতি কাজে মশগুল থাকা; ধর্মীয় বই-পুস্তক, তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ও ইসলামি সাহিত্য পড়া ও অন্যকে পড়তে সাহায্য করা; দীনী মজলিশ ও মাহফিল আয়োজন করা; অধীনস্থ কর্মচারী ও শ্রমিকদের কাজের চাপ কমিয়ে দেওয়া এবং তাদের পূর্ণ মজুরি ও অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান করা; বেশি বেশি দান খয়রাত করা; ইহসান তথা সদা আল্লাহর অস্তিত্বের উপস্থিতির ধ্যান

করা ও আল্লাহর সঙ্গ বাস্তবে অনুভব করা অথবা আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারির চেতনা মনে জাগ্রত রাখা। (বুখারি: ৪৮)।

রমজানে পবিত্রতা রক্ষা করা; সকল প্রকার অন্যায় অবিচার জুলুম অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকা ও অন্যদেরও দূরে রাখা; কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করা; সবার সঙ্গে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করা; আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করা; গরিব আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সেহরি ও ইফতারের ব্যবস্থা করা; মা–বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানদের সামর্থ্য মতো নতুন জামা কাপড় ও বিভিন্ন উপহার উপঢৌকন দেওয়া রমজানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ মাহাত্ম্যপূর্ণ ইবাদত

১০.রোজার উপকারিতা :

রমজানের একটি বিশেষ ফজিলত বা মাহাত্ম্য হচ্ছে,এই পবিত্র রমজান মাসে আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রমজান মাসের রোজা মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দেয়,মানুষের কুপ্রবৃত্তি ধুয়ে মুছে দেয় এবং আত্মাকে দহন করে ঈমানের শাখা প্রশাখা সঞ্জিবীত করে। সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এই মর্মে মহানবী ইরশাদ করেছেন,

"রোজাদারের জন্য দুটি খুশি। একটি হলো তার ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।"

—(বুখারী ও মুসলিম)

রোজা রাখার রয়েছে অনেকগুলো উপকারিতা। ধর্মীও কিংবা আত্ম-প্রশান্তির দিক ছাড়াও রোজার রয়েছে কিছু শারীরিক উপকারিতাও। এই নিয়ে অনেকগুলো গবেষণা হয়েছে এবং আরও অনেক গবেষণা চলছে। কিছু বিষয়ে এখনও পুরোপুরি সিদ্ধান্তে আসা না গেলেও বেশ সন্তুষ্টিজনক ফলাফল মিলেছে। এমনিতে বছরের অন্যান্য সময়ে একবেলার খাবার বাদ দিলেই তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে একটি নির্দিষ্ট রুটিনে সেহরি ও ইফতার খেয়ে রোজা রাখলে তা শরীরের জন্য উপকারিতা নিয়ে আসে

১. প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ

রোজা রাখলে তা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীরের ক্ষমতা উন্নত করে বলে মনে করা হয়। যেমন হৃদরোগ, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের মতো সমস্যার ঝুঁকি কমে রোজা রাখার ফলে এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

২. তারুণ্য ধরে রাখে

রোজা রাখা এবং বিশেষ করে কম প্রোটিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস শরীরে তারুণ্য ধরে রাখতে কাজ করে। রোজা মানুষের বৃদ্ধির হরমোনের স্তরকে উন্নীত করে বলে মনে করা হয়। এই হরমোন শরীরের বৃদ্ধি, বিপাক, ওজন হ্রাস, পেশী শক্তি এবং ব্যায়ামের কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সম্পর্কিত বর্তমান গবেষণা মূলত প্রাণিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই এটি কীভাবে মানুষের তারুণ্যকে প্রভাবিত করে তা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।

৩. মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে

প্রাণিদের ওপর করা গবেষণায় দেখা গেছে যে, রোজা রাখলে তা পার্কিনসন এবং আলঝাইমারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং ফলাফল উন্নত করে। সেইসঙ্গে স্মৃতিশক্তি এবং মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াকরণকে বাড়িয়ে মস্তিষ্কের কার্যকারিতাও উন্নত করে। প্রানিজ গবেষণায়

পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, রোজা রাখলে তা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং স্নায়ু কোষের উৎপাদন বাড়ায়। তবে মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণের জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

৪. উদ্বেগ কমায়

মানব গবেষণার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোজা উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার লক্ষণ কমায় এবং সামাজিক সংযোগ উন্নত করতে পারে। এই প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করার জন্য আরও অধ্যয়ন প্রয়োজন তবে এখনও পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলগুলো সন্তুষ্টিজনক।

১১.রোজার নিয়ত :

রোজার নিয়ত

রোজা পালনে সেহরি ও ইফতার গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি রোজার নিয়তও জরুরি। তবে এই ক্ষেত্রে রোজা রাখার উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে ওঠা ও সাহরি খাওয়াটাই রোজার নিয়তের অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত মনের ইচ্ছাই হলো- নিয়ত। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। তাই কেউ মুখে নিয়ত না করলেও তার রোজাগুলো আদায় হয়ে যাবে। (সূত্র : আল-বাহরুর রায়েক : ২/৪৫২; আল-জাওহারুতুন নাইয়্যিরাহ : ১/১৭৬; রাদ্দুল মুহতার

রোজার যে নিয়ত প্রচলিত

বাংলাদেশে রোজার একটি আরবি নিয়ত প্রসিদ্ধ। যেটা মানুষ মুখে পড়ে থাকেন। তবে এটি হাদিস ও ফিকাহের কোনো কিতাবে বর্ণিত হয়নি। তবে কেউ চাইলে পড়তে পারেন। তবে জেনে রাখা উচিত যে, নিয়ত পড়ার চেয়ে নিয়ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

আরবি নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَكَ يَا اللهُ فَتَقَبَّل مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم

১২.স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোজার ভূমিকা :

রোজা মানব স্বাস্থ্যের বিরাট উপকার সাধন করে। সারা বছর অনিয়মিত বা অতিরিক্ত পানাহার ও অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য খেয়ে রক্তে যখন প্রচুর কোলেস্টেরেল জমে প্রেশার বা অন্য যে-কোনো পীড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তখন রোজার উপবাস রক্তের কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের আশঙ্কা মুক্ত করে। অতি ভোজনের অত্যাচারে পাকস্থলী যখন হতোদ্যম ও দুর্বল হয়ে পড়ে তখন একমাসের রোজা পাকস্থলীকে সবল করে নতুন জীবন দান করে, ফলে রক্ত ও রক্তনালীগুলো পরিস্কার হয়ে যায়। রোজা শুরুর কিছু দিনের মধ্যে রোজাদার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিতে পারেন। কারণ ক্ষুধার চিরাচরিত অভ্যাস রোজা শুরুর প্রথম কয়েকদিনই একটু যন্ত্রণা দেয় মাত্র, পরে এটাও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর সিয়াম সাধনা বা রোজা অনুশীলনকারী ব্যক্তি প্রতিদিনই মানসিকভাবে নিজেকে প্রাণময়, চঞ্চল ও উৎফুল্ল মনে করেন। জীবন চাঞ্চল্যের নবতর প্রবাহ শরীরে জীবনতরঙ্গের সৃষ্টি করে। রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ থাকায় উভয়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আহার গ্রহণের রুটিন ঠিক থাকায় মহিলাদের মাসিক ঋতুজনিত কোনো ধরনের অসুবিধা থাকলে তাও ঠিক হয়ে যায়। খাবারের উপাদান থেকে সারা বছর ধরে মানুষের শরীরের জমে থাকা কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ, চর্বি ও আবর্জনা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে উপবাস।

রোজা রাখার ফলে দেহের অভ্যন্তরে দহনের সৃষ্টি হয় এবং শরীরের ভিতরে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থগুলো দগ্ধ হয়ে যায়। উপবাসকালে শরীরের মধ্যস্থিত প্রোটিন, ফ্যাট ও শর্করাজাতীয় পদার্থসমূহ স্বয়ং পাচিত হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোষগুলোতে পুষ্টি বিধান হয়। ফলে শরীরে উৎপন্ন উৎসেচকগুলো বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে যায়। এটি হচ্ছে শারীরিক বিক্রিয়ার এক স্বাভাবিক পদ্ধতি। রোজা এই পদ্ধতিকে সহজ, সাবলীল ও গতিময় করে। রোজার উপবাসের মাধ্যমে লিভারে রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয় ফলে ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি, পেশির প্রোটিন, গ্রন্থিসমূহ এবং লিভারের কোষসমূহ আন্দোলিত হয়। অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলোর সংরক্ষণ এবং হৃৎপিন্ডের নিরাপত্তার জন্য অন্য দেহযন্ত্রগুলোর বিক্রিয়া বন্ধ রাখে। খাদ্যাভাবে বা আরাম-আয়েশের জন্য মানুষের শরীরে যে ক্ষতি হয় রোজা তা পূরণ করে দেয়। এছাড়া, মানুষের শরীরে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও রোজা অনেক উপকার সাধন করে। তাই বর্তমানে অনেক দূরারোগ্য রোগ, যেমন-হৃদরোগ চর্মরোগ, বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্থ'লকায় রোগী, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগ নিরাময়ে রোজা রাখার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। রোজা এসব রোগের কষ্ট দূর করে। রোজা রাখার ফলে শরীরের মধ্যস্থিত অনেক ক্ষতিকারক টক্সিনের বিষক্রিয়া থেকে শরীর রক্ষা পায়। এটি অতি স্বাভাবিক ও অত্যন্ত কার্যকরী পন্থায় অভ্যন্তরে বিধৌত ও পরিচ্ছন্ন হয়। তাই আধ্যাত্মিক সুফি সাধকদের মতে, হৃদয়ের ক্ষমতা হাসিলে স্বল্প খাদ্য গ্রহণের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। রোজার সময়ে মানুষের শরীরের বিপাক ক্রিয়া বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে কিছুটা পরিবর্তিত হয় বলে সহজপাচ্য অর্থাৎ সহজে হজম হয় এ জাতীয় খাবার গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং, স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে রমজান মাসে রোজাদারদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

১৩.অপরাধ দমনে রোজার ভূমিকা

আধুনিক পৃথিবীতে অপরাধ দমনের দুটি ব্যবস্থা আছে—আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। সত্যি কথা বলতে কী, এ দুই পন্থায় সমাজ থেকে অপরাধ দমন বা নির্মূল সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই বিশ্বে দিন দিন অপরাধ ও অপকর্ম বাড়ছে। একের পর এক আইন প্রণয়ন করা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয় না; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনকে ব্যবহার করা হয় বেআইনি কাজে।মহান আল্লাহ এ পৃথিবীকে অপরাধমুক্ত করার জন্য তিনটি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।

এক. আইন (কোরআন ও সুন্নাহ)।

দুই. তাকওয়া (খোদাভীতির মাধ্যমে আইনের প্রতি মানুষকে অনুগত করে তোলা)।

তিন. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

ইতিহাস সাক্ষী, এই ব্যবস্থাপত্র শত ভাগ সফল হয়েছিল। কারণ এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আইন প্রণয়নের পরই মানুষকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া আইন বাস্তবায়নে শত ভাগ সফল হয়েছিল। সুরা মায়েদার ৯০ নম্বর আয়াত নাজিল করে যখন মদ নিষিদ্ধ করা হলো, তখন রাসুলে আকরাম (সা.) হাফেজ সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন গলিতে গলিতে আয়াতটি পাঠ করার জন্য।

আইন প্রণেতার ভয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধার ফলে তখন কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক ছাড়াই সাহাবায়ে কেরাম মদ ত্যাগ করলেন। মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা শুনে যাঁর হাতে মদের গ্লাস ছিল তিনি তা ছুড়ে ফেললেন, যাঁর মুখে মদ ছিল তিনি তা ফেলে দিয়ে

কুলি করলেন, যিনি ওই সময় মদ পানরত ছিলেন, তিনি গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে পেট থেকে মদ বের করার চেষ্টা করলেন। যাঁর বাড়িতে মদের কলসি ছিল, তিনি লাথি মেরে তা ভেঙে ফেললেন। মদিনার রাস্তায় মদ প্রবাহিত হয়ে গেল। (ইবনে কাসির : ৭/৯০৯)

রোজা অপরাধ দমনের দ্বিতীয় পন্থা করে

আধুনিক পৃথিবীতে অপরাধ দমনের দুটি ব্যবস্থা আছে—আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। সত্যি কথা বলতে কী, এ দুই পন্থায় সমাজ থেকে অপরাধ দমন বা নির্মূল সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই বিশ্বে দিন দিন অপরাধ ও অপকর্ম বাড়ছে। একের পর এক আইন প্রণয়ন করা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয় না; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনকে ব্যবহার করা হয় বেআইনি কাজে।

মহান আল্লাহ এ পৃথিবীকে অপরাধমুক্ত করার জন্য তিনটি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।

এক. আইন (কোরআন ও সুন্নাহ)।

দুই. তাকওয়া (খোদাভীতির মাধ্যমে আইনের প্রতি মানুষকে অনুগত করে তোলা)।

তিন. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

ইতিহাস সাক্ষী, এই ব্যবস্থাপত্র শত ভাগ সফল হয়েছিল। কারণ এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আইন প্রণয়নের পরই মানুষকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া আইন বাস্তবায়নে শত ভাগ সফল হয়েছিল। সুরা মায়েদার ৯০ নম্বর

আয়াত নাজিল করে যখন মদ নিষিদ্ধ করা হলো, তখন রাসুলে আকরাম (সা.) হাফেজ সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন গলিতে গলিতে আয়াতটি পাঠ করার জন্য।

আইন প্রণেতার ভয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধার ফলে তখন কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক ছাড়াই সাহাবায়ে কেরাম মদ ত্যাগ করলেন। মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা শুনে যাঁর হাতে মদের গ্লাস ছিল তিনি তা ছুড়ে ফেললেন, যাঁর মুখে মদ ছিল তিনি তা ফেলে দিয়ে কুলি করলেন, যিনি ওই সময় মদ পানরত ছিলেন, তিনি গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে পেট থেকে মদ বের করার চেষ্টা করলেন। যাঁর বাড়িতে মদের কলসি ছিল, তিনি লাথি মেরে তা ভেঙে ফেললেন। মদিনার রাস্তায় মদ প্রবাহিত হয়ে গেল। (ইবনে কাসির : ৭/৯০৯)

রোজা অপরাধ দমনের দ্বিতীয় পন্থা কার্যকর করে তোলে।

রোজার পরিপূর্ণ ফজিলত পেতে হলে পাপ বর্জন করতে হয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি পাপ, মিথ্যা কথা, অন্যায় কাজ ও মূর্খতাসুলভ কাজ ত্যাগ করতে না পারবে, তার পানাহার ত্যাগ করা আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন নেই।' (বুখারি : ৫/২২৫১)

রোজার মাধ্যমে মানুষের সততা ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। রোজাদার ব্যক্তির সৎ ও পুণ্যবান থাকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সমাজে নীতিনৈতিকতা ও সততার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রোজাদার ব্যক্তি রোজা রেখে চরম ধৈর্য, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার পরিচয় দেয়। এখানে তার

আল্লাহভীতি ও নৈতিক শক্তি প্রকাশ পায়। এ মাসে পরনিন্দা, মিথ্যা, অহেতুক কথা ও কাজ বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ রোজা থাকে, সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং মূর্খের মতো কাজ না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যেন বলে, আমি রোজাদার, আমি রোজাদার।' (বুখারি, হাদিস : ১৯০৪, মুসলিম, হাদিস : ১১৫১)

রমজানে বৈধভাবে উপার্জনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কেননা হারাম বস্তু খেয়ে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। এভাবেই রোজা ও রমজান অপরাধ দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৪.উত্তম চরিত্র গঠনে রোজার ভূমিকা :

মাহে রমজান নিজেকে পুনর্গঠন করার মাস। নিজেকে বদলে ফেলার মাস। উত্তম চরিত্র গঠনের মাস। এ মাসে এমন প্রশিক্ষণ নিতে হবে, যার মাধ্যমে বাকি মাসগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। কাজেই এ সময় আমাদের সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুশীলন করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোনো দিন সিয়াম অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়, সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও জাহিলি আচরণ না করে। যদি কেউ তাকে গালাগাল করে বা তার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালনকারী, আমি সিয়াম পালনকারী। ' (মুসলিম, হাদিস : ২৫৯৩) কোরআন ও হাদিসে

মানুষের সব ধরনের মন্দ স্বভাব পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমন কয়েকটি মন্দ স্বভাব হলো—

১. অহংকার : অহংকার বা আত্মম্ভরিতা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম স্বভাব। আল্লাহ অহংকার অপছন্দ করেন এবং তা মানুষের পতন ডেকে আনে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ কোনো উদ্ধত-অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ’ (সুরা লোকমান, আয়াত : ১৮)রমজানের প্রতি রাতে জিবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে কোরআন পাঠ করতেন। এ সময় রাসুল (সা.) প্রবহমান বাতাসের চেয়েও বেশি দান করতেন। ’ (বুখারি, হাদিস : ৬; মুসলিম, হাদিস : ২৩০৮)

৫. অপব্যয় ও অপচয় : ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমন দোষণীয়, অনুরূপ অপব্যয় এবং অপচয় দোষণীয়। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কাজেও অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা খাও এবং পান করো; কিন্তু অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। ’ (সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১)মাহে রমজানে পরিমিত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে অপব্যয় ও অপচয় থেকে বিরত থাকার শিক্ষা রয়েছে।

৬. ক্রোধ ও রাগ : অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানুষের হিতাহিত জ্ঞান কেড়ে নেয় এবং অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ব করে। ফলে পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিকে লজ্জিত হতে হয়। আল্লাহ বলেন, ‘যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। ’ (সুরা আশ-শুরা, আয়াত : ৩৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ওই ব্যক্তি বীর পুরুষ নয়, যে অন্যকে ধরাশায়ী করে; বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। ’ (বুখারি, হাদিস : ৬১১৪)

৭. হিংসা-বিদ্বেষ : ইসলামের দৃষ্টিতে হিংসা একটি মানসিক ব্যাধি, যা মানুষের মানসিক স্বস্তি ও শান্তি নষ্ট করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্টের কারণ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, ‘তোমরা হিংসা থেকে বিরত থাকো। কেননা হিংসা নেক আমলকে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। ’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৭৩)

৮. গালি দেওয়া : গালি দেওয়া এবং অশ্লীল ওঅকথ্য ভাষা ব্যবহার করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘মুমিনের সঙ্গে লড়াই করা কুফরি এবং তাকে গালি দেওয়া ফিসক (প্রকাশ্য পাপ)। ’ (নাসাঈ, হাদিস : ৪১১৩)

রোজাদারের জিহ্বা রোজা রাখে পরচর্চা বা গিবত থেকে, চোগলখোরি থেকে, অশ্লীল ও মিথ্যা কথা থেকে। দূরে থাকে মূর্খামি ও বেয়াকুফি করা থেকে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুসারে কাজ করা আর মূর্খতা পরিহার করল না, আল্লাহ তার পানাহার বর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই। ’ (বুখারি, হাদিস : ৬০৫৭)

তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, ‘হে ইমানদাররা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’ (সুরা আল বাকারা, আয়াত : ১৮৩)

এ আয়াতে রোজা ফরজ করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সতর্ক হওয়া, ভয় করা, সংযত হওয়া, বেঁচে থাকা, পরহেজ করা, শক্তি সঞ্চয় করা, দায়িত্বশীল হওয়া, জবাবদিহির দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদন করা। পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয় সতর্ক ও সচেতনতার সঙ্গে পরকালে আল্লাহতায়ালার কাছে জবাবদিহির মনোভাব নিয়ে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সব কাজ সম্পাদন করা। তার সন্তুষ্টির পরিপন্থী সব কাজ বর্জন করা।

তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য হলো ছয়টি। যেমন- ১. সত্যের সন্ধান, ২. সত্য গ্রহণ, ৩. সত্যের ওপর অটল থাকা, ৪. আল্লাহভীতি, ৫. দায়িত্বানুভূতি, ৬. জবাবদিহিভিত্তিক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদন। আলোচ্য ছয়টি বৈশিষ্ট্যের আলোকে জীবনের সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সব কাজ সম্পাদন করা, তার সন্তুষ্টির পরিপন্থী সব মত ও পথ পরিহার করা, যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং যে পথে চললে তার সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হয়, তা বর্জন করার নামই তাকওয়া।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

সিয়াম সাধনার আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, বান্দার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহতায়ালার অগণিত নেয়ামতের, বিশেষ করে দীনের সঠিক পথের সন্ধান দানের জন্য শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করা। বান্দার প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো দীনের হেদায়েত দান। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, ‘রমজান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েতের ও সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশক, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাস পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য সময় গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না। যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহতায়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

এ আয়াতে সিয়াম ফরজ করার কারণ

রমজান মাসকে বলা হয় ধৈর্য ও সহ-মমতার মাস।

আত্মশুদ্ধি ও প্রবৃত্তি দমন

সিয়াম সাধনা প্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে কামনা-বাসনার শিখা নির্বাপিত করে। আত্মার লালসা দূরীভূত করে মুমিনের দেহ ও মনে পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করে। ফলে সিয়াম সাধনা আত্মশুদ্ধির অন্যতম সুযোগ। সিয়াম প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই করে দিয়ে মুত্তাকি হওয়ার পরম সুযোগ করে দেয়। সিয়াম সাধনা অনর্থক কাজ, মিথ্যা বচন, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, অসৎকর্ম, কর্কশ বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখে। মহানবী (সা.) বলেন, পাঁচটি জিনিস সিয়াম নষ্ট করে দেয়। তা হলো- মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, কূটনামি, মিথ্যা শপথ ও কামভাবে দৃষ্টিপাত। মহানবী

(সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কাজ করা ছাড়তে পারল না, তার পানাহার ত্যাগ তথা রোজা রাখা আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।' (বোখারি, হাদিস : ১৭৭০)

ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত হওয়া

সিয়াম সাধনা মানুষকে ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত করে। ইমাম গাজালি (রহ.) 'ইয়াহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বলেছেন, 'আখলাকে ইলাহি তথা ঐশ্বরিক গুণে মানুষকে গুণান্বিত করে তোলাই সিয়ামের উদ্দেশ্য। আল্লাহতায়ালা পানাহার করেন না। রোজাদার পানাহার বর্জনের ফলে আখলাকে ইলাহির গুণে গুণান্বিত হয়। তদ্রুপ সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোজাদার ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত হয়। ফেরেশতারা যেমন পানাহার করে না, রোজাদারও পানাহার করে না। ফলে পানাহার ও কামাচার বর্জনের দিক দিয়ে ফেরেশতা ও রোজাদার সমগুণে গুণান্বিত হয়। ফলে রোজাদার এমন মর্যাদাসম্পন্ন হয় যে, তার মুখের গন্ধ আল্লাহতায়ালার কাছে মৃগনাভির সুঘ্রাণের চেয়েও উত্তম। (মুসলিম, হাদিস : ১৯৪৫)

বিবেকের শাসন

মানব দেহের মূল হলো নফস বা আত্মা। এই আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মন্দ চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র পন্থা হলো সিয়াম পালন। নফস বা প্রবৃত্তিকে বিবেকের শাসন মানতে অভ্যস্ত করে তোলাই সিয়ামের উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি ও বিবেক এই দুয়ের জয়-পরাজয় নিয়েই মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও সততার জয়-পরাজয় সূচিত হয়ে থাকে আর সিয়াম পালনের মাধ্যমেই পশুত্বের ওপর সততা ও অন্যায়ের ওপর ন্যায় বিজয়ী হয়।

পাপমুক্তি

সিয়াম সাধনা নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার শ্রেষ্ঠ পন্থা। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল অথচ গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারল না, সে ধ্বংস হোক। (আদারুল মুদরাবাদ, ইমাম বোখারি) এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময়, শেষ রাতে, কদরের রাতে, জুমার দিনে। এ মাসের দানে ৭০০ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। একটি নফল আদায় করলে ফরজের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহতায়ালা নিজে সিয়াম পালনকারীর প্রতিদান প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। (মুসলিম, হাদিস : ১৯৪৫)

জান্নাতে একটি দরজার নাম রাইয়ান, যা দিয়ে শুধু রোজাদাররাই প্রবেশ করবেন। এ মাসের প্রম ১০ দিন রহমতের, মধ্য ১০ দিন মাগফিরাতের এবং শেষ ১০ দিন নাজাতের। অতএব, সবদিক বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয় যে নিজেকে পাপমুক্ত রাখার এবং অধিক পুণ্য লাভের মুখ্য সময় হলো এ মাহে রমজান।

১৫.যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না:

মাহে রমজান। মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও অনুকম্পার মাস। রহমত বরকত মাগফেরাত ও নাজাতের মাস এই রমজান। পবিত্র রমজান মাসে মুসলিম উম্মাহর সঠিকভাবে রোজা পালন করা উচিৎ।

সঠিকভাবে ইসলামিক বিধান মোতাবেক রোজা পালন করতে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে- তার মধ্যে রয়েছে, রোজা কাজা, রোজা ভঙ্গ ইত্যাদি বিষয়। যেসব কাজ করলে রোজা ভাঙবে না- তা-ই আজকের আলোচনা বিষয়বস্তু।

১. ভুল করে কোনো কিছু খেয়ে ফেললে রোজা ভঙ্গ হবে না। (সহীহ বোখারী : ২৫৯)।

২. মশা-মাছি বা কীটপতঙ্গ ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটের ভেতর ঢুকে গেলেও রোজা ভাঙবে না। (ইবনে আবি শাইবা : ৬/৩৪৯।

৩. অনিচ্ছাকৃত বমি হলে (এমনকি মুখ ভরে হলেও) রোজা ভাঙবে না। তেমনি বমি মুখে এসে নিজে নিজেই ভেতরে চলে গেলেও রোজা ভাঙবে না। (জামে তিরমিজি : ১/১৫৩)।

৪. রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোজা নষ্ট হবে না। তবে রোজা স্মরণ হওয়ামাত্র পানাহার ছেড়ে দিতে হবে। (সহীহ মুসলিম : ১/২০২)।

৫. দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে পেটের মধ্যে না গেলে রোজা ভাঙবে না।

(ফতোয়ায়ে শামী : ৩/৩৬৭)।

৬. কোনো খাদ্যদ্রব্য বুট বা ছোট ছোলার কম পরিমাণ যদি দাঁতের সঙ্গে লেগে থাকে ও গলার ভেতর চলে যায়, তাহলে রোজা ভাঙবে না। তবে দাঁত থেকে বের করে হাতে নিয়ে স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেললে রোজা নিশ্চিতভাবে ভেঙে যাবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২০২)।

৭. অতিরিক্ত গরম বা পিপাসার কারণে যদি গোসলের মাধ্যমে শরীরকে ঠাণ্ডা করা হয়, তাহলেও রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২০৩)।

৮. কুলি করার পর পানির অবশিষ্ট আর্দ্রতা থুথুর সঙ্গে গিলে ফেললে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২০৩)।

৯. ঘাম অথবা চোখের অশ্রুর দু-এক ফোঁটা যদি অনিচ্ছায় মুখে চলে যায়, তাহলে রোজা নষ্ট হবে না। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২০৩)।

১০. কানের ময়লা বের করার দ্বারাও রোজা ভাঙবে না। (মারাকিল ফালাহ : ৩৪২)।

১১. যদি পান খাওয়ার পরে খুব ভালোভাবে কুলি করার পরও রোজা অবস্থায় থুথুর সঙ্গে লাল রং বের হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২০৩)।

১২. নাক এত জোরে সাফ করা, যার ফলে কফ গলার মধ্যে চলে যায়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। (দুররে মুখতার : ৩/৩৭৩)।

১৩. রোজা অবস্থায় আঁতর বা ফুলের ঘ্রাণ নিলেও কোনো সমস্যা নেই। (মারাকিল ফালাহ : ৩৬১)।

১৪. শরীর বা মাথায় তেল ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না, বরং তা বৈধ। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৪/৩১৩)।

১৫. রোজা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত মুখের মধ্যে ধুলাবালি ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না। (দুররে মুখতার : ৩/৩৬৬)।

১৬. যদি রোজাদারের গোসলের সময় অথবা বৃষ্টিতে ভেজার সময় কানের মধ্যে অনিচ্ছায় পানি চলে যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে রোজা নষ্ট হবে না। (ফাতহুল কাদির : ২/৩৪৭)।

১৭. সুস্থ অবস্থায় রোজার নিয়ত করার পর যদি অজ্ঞান, অচেতন বা পাগল হয়ে যায়, তাহলে রোজা নষ্ট হবে না। (সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/২৩৫)।

১৬.রোজা সম্পর্কে কিছু হাদিস :

বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, ‘কিয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমি তাকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।’ কোরআন বলবে, ‘আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।’ মহানবী (সা.) আরও বলেন, ‘অতএব উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।’ (মুসনাদে আহমাদ, সহিহ তারগিব, হাদিস: ৯৬৯)

হিজরি সনের সেরা মাস রমজান। এ মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রোজা। রোজা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত। এর প্রতিদান তিনি নিজ হাতেই দেবেন। রোজার ফজিলত-মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ সম্পর্কিত ৮টি হাদিস তুলে ধরা হলো—

১। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হাদিসে কুদসিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য—রোজা ব্যতীত। কারণ, রোজা আমার জন্যই এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।’ (মহানবী সা. আরও বলেন) ‘রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ! অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চেয়েও সুগন্ধময়।

রোজাদারের জন্য রয়েছে দুটি খুশির মুহূর্ত আছে, যা তাকে আনন্দিত করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে।' (বুখারি, হাদিস: ১৯০৪)

২। হজরত হুজায়ফা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফেতনা ও গুনাহর কাফফারা হলো নামাজ, রোজা ও সদকা।' (বুখারি, হাদিস: ১৮৯৫)

৩। হজরত সাহল ইবনে সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, 'জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন ওই প্রবেশদ্বার দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ও দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে, 'কোথায় রোজাদারগণ?' সুতরাং তারা ওই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। এর পর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করা হবে। ফলে তা দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারি, হাদিস: ১৮৯৬)

বর্ণিত, মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, 'রোজা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল থাকে।' (মুসনাদে আহমাদ, সহিহুল জামিউস সাগির, হাদিস: ৩৮৭৯)

৪। হজরত আবু সাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে বান্দা আল্লাহর পথে একদিন মাত্র রোজা রাখবে, সেই বান্দাকে আল্লাহ বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।' (বুখারি, হাদিস: ২৮৪০)

৫। হজরত উসমান বিন আবুল আস থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, ‘রোজা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল থাকে।’ (মুসনাদে আহমাদ, সহিহুল জামিউস সাগির, হাদিস: ৩৮৭৯

৬। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, ‘কিয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমি তাকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।’ কোরআন বলবে, ‘আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।’ মহানবী (সা.) আরও বলেন, ‘অতএব উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।’ (মুসনাদে আহমাদ, সহিহ তারগিব, হাদিস: ৯৬৯)

৭। হজরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কোনো আমলের আজ্ঞা করুন; যার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন।’ (অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘যার মাধ্যমে আমি জান্নাত যেতে পারব’) তিনি বললেন, ‘তুমি রোজা রাখো। কারণ, এর সমতুল্য কিছু নেই।’ পুনরায় আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।’ তিনি পুনরায় একই কথা বললেন, ‘তুমি রোজা রাখো। কারণ, এর সমতুল্য কিছু নেই।’ (নাসায়ি, সহিহ্ তারগিব, হাদিস: ৯৭৩)

৮। হজরত হুজায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোজা রাখার পর যে

ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কিছু সদকা করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।' (মুসনাদে আহমাদ, সহিহ্ তারগিব, হাদিস।

১৭.নকল রোজার ফজিলত ও বিধান:

রমজান মাসে রোজা পালন করা ফরজ। কোনো কারণ ছাড়া রমজানের ফরজ রোজা ভেঙে ফেললে তার কাজা ও কাফফারা রোজা পালন করা ফরজ। রমজানে ফরজ রোজা না রাখলে বা কোনো কারণবশত ছেড়ে দিলে তার কাজা আদায় করা ফরজ। এ ছাড়া মানত রোজা পালন করা এবং নফল রোজা রেখে ছেড়ে দিলে বা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় নফল রোজা ভেঙে ফেললে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। ফরজ ও ওয়াজিব রোজা ছাড়া অন্যান্য রোজাকে নফল রোজা বলা হয়; নফল মানে অতিরিক্ত, ফরজ বা ওয়াজিব নয়। মূলত এই নফল রোজা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো নির্ধারিত বা রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক পালনকৃত, এই প্রকার রোজা সুন্নত। দ্বিতীয় প্রকার হলো অনির্ধারিত, এগুলো মুস্তাহাব। এই উভয় প্রকার রোজাকে সাধারণভাবে নফল রোজা বলা হয়ে থাকে।

বর্ণনা করেন, হাদিসে কুদসিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে 'আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা আমারই জন্য, আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব; রোজা আমারই জন্য আমি নিজেই তার প্রতিদান।' (বুখারি ও মুসলিম)।

রমজান মাসের রোজা ও অন্যান্য রোজার নিয়তের তারতম্য রমজান মাসের রোজা ও অন্যান্য রোজার নিয়তের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। রমজান মাসের ফরজ রোজার

নিয়ত মধ্য দিবসের পূর্ব পর্যন্ত তথা দুপুর ১২টার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে করা যায়। রমজান মাসের ফরজ রোজা ভিন্ন অন্যান্য রোজার নিয়ত ‘সুবহে সাদিক’-এর আগে তথা সেহ্রির সময়ের মধ্যে বা তার আগেই করতে হয়। কারণ, রমজান মাসের ফরজ রোজার সময় নির্ধারিত এবং তা বাধ্যতামূলক; আর অন্যান্য রোজার কোনো নির্ধারিত সময় নেই এবং এগুলো রমজান মাসের ফরজ রোজার মতো বাধ্যতামূলক অপরিহার্য ফরজ কর্তব্য নয়।

রোজার আদব

রোজার সাতটি আদব রয়েছে, যা রোজা কবুলে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এক. চোখের হেফাজত; দুই. জবানের হেফাজত; তিন. কানের হেফাজত; চার. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হেফাজত; পাঁচ. অল্প সেহ্রি; ছয়. স্বল্প ইফতার; সাত. আল্লাহর প্রতি অনুরাগ।

মেহমান ও মেজবানের সম্মানে নফল রোজা ছেড়ে দেওয়া

>নফল রোজা দুই প্রকার; প্রথম প্রকার হলো নির্ধারিত বা নবী করিম (সা.) কর্তৃক পালনকৃত, এই প্রকার রোজা সুন্নত; দ্বিতীয় প্রকার হলো অনির্ধারিত, এগুলো মুস্তাহাব। এই উভয় প্রকার রোজাকে সাধারণভাবে নফল রোজা বলা হয়ে থাকে

নফল রোজা পালন অবস্থায় যদি অতিথি আপ্যায়ন করাতে হয় বা আপ্যায়ন গ্রহণ করতে হয়, তাহলে নফল রোজা ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হবে এবং পরবর্তী সময়ে এই রোজা কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এতে তিন গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। প্রথমত, নফল রোজা রাখার সওয়াব; দ্বিতীয়ত, মেহমান (গেস্ট) বা মেজবান (হোস্ট)-এর সম্মান

রক্ষার সওয়াব; তৃতীয়ত, নফল রোজা ভাঙার পরিবর্তে ওয়াজিব কাজা রোজা আদায় করার সওয়াব।

হজরত উম্মে হানি (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন ফাতিমা (রা.) এলেন, তিনি নবীজি (সা.)-এর বাঁ পাশে বসলেন এবং উম্মে হানি (রা.) নবীজি (সা.)-এর ডান পাশে বসলেন। এমতাবস্থায় ওয়ালিদাহ একটি পানপাত্র নিয়ে এল। নবীজি (সা.) তা থেকে পান করলেন, তারপর উম্মে হানি (রা.) পান করলেন। এরপর উম্মে হানি (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আমি রোজা ছিলাম এখন ইফতার (ভঙ্গ) করলাম। নবীজি (সা.) বললেন, তুমি কি কাজা রোজা করছিলে? উম্মে হানি (রা.) বললেন, না। তিনি বললেন, যদি তুমি নফল রোজা রাখো তবে তা ভাঙায় কোনো দোষ নেই। (আবু দাউদ, তিরমিজি ও দারমি)।

হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি ও হাফসা রোজা ছিলাম; আমাদের সামনে খাবার পেশ করা হলো, আমাদেরও খেতে ইচ্ছে হলো; আমরা আহার করলাম। হাফসা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আমরা রোজা ছিলাম, আমাদের সামনে খানা পেশ করা হলো, আমাদেরও খাওয়ার আগ্রহ ছিল; তাই আমরা খেলাম। নবীজি (সা.) বললেন, তোমরা এই রোজা অন্য দিন কাজা করে নেবে। (তিরমিজি)

রোজা রাখার নিষিদ্ধ দিবসসমূহ

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোরবানির ঈদের দিন ও রোজার ঈদের দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)। হজরত নুবায়শা হুজালি (রা.)

বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আইয়ামে তাশরিক (জিলহজ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ) হলো খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর স্মরণ করার জন্য।' (মুসলিম)। জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতে অবস্থানকারীরা রোজা রাখবেন না; অন্যরা রোজা রাখতে পারবেন।

বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষেধ তথা নাজায়েজ ও হারাম। যথা: রোজার ঈদের দিন, কোরবানির ঈদের দিন ও তৎপরবর্তী তিন দিন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা এ দিবসগুলোতে রোজা রাখবে না। কারণ, এই দিনগুলো শুধুই পান, আহার ও খেল-তামাশার (আনন্দ-ফুর্তি উপভোগের) জন্য।

সতর্কতা

নফল রোজা রেখে ইফতার যেন মাগরিবের নামাজের জামাত ছুটে যাওয়ার কারণ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। রমজান মাসে সবাই ফরজ রোজা পালন করেন বিধায়, সবার জামাতে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে মাগরিবের নামাজের জামাত কিছুটা বিলম্বে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু রমজান ছাড়া অন্য সময় যেহেতু মাগরিবের নামাজের জামাত বিলম্বিত হবে না; তাই মসজিদে পানি দিয়ে ইফতার করে জামাতে শামিল হওয়া বাঞ্ছনীয়

সাপ্তাহিক ও মাসিক নফল রোজা : রমজানের রোজা ইসলামের আবশ্যকীয় মৌলিক বিধান। রমজানের ফরজ রোজার পাশাপাশি নফল রোজারও অনেক ফজিলত ও গুরুত্ব রয়েছে। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে নফল রোজা রেখেছেন এবং উম্মতকে তা পালনে

যথাযথ উৎসাহ প্রদান করেছেন। নফল রোজার মধ্যে সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার এবং মাসে তিন রোজার ফজিলত তুলে ধরা হলো-

সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা

সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার এ দুই দিন রোজা পালন করা সুন্নত। কেননা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই দিন রোজা রাখতে পছন্দ করতেন। হজরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সোমবারের রোজা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন, ‘এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং এ দিনে আমাকে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে বা আমার ওপর কোরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে।’ -সহিহ মুসলিম : ১১৬২

অন্য হাদিসে এসেছে, ‘(প্রতি সপ্তাহে) সোম ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয়। কাজেই রোজাদার অবস্থায় আমার আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোকএমনটি আমি পছন্দ করছি।’ -সুনানে তিরমিজি : ৭৪৭

কোনো বর্ণনায় আছে, সোমবার নবী করিম (সা.) ইন্তেকাল করেন, সোমবার মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় রওনা করেন, সোমবার মদিনায় পৌঁছান এবং সোমবার তিনি হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন। নবী করিম (সা.) নিজে প্রতি সোমবার রোজা রাখতেন। সাপ্তাহিক রোজার এই আমল সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতেন। নবী করিম (সা.)-কে নিখাদ ভালোবাসার দাবি হলোনবী করিম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের মতো সোমবার রোজা রাখা।

মাসে তিন রোজা

চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজার অনেক ফজিলতের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। চান্দ্রমাসের এই তিন দিনকে শরিয়তের পরিভাষায় ‘আইয়ামে বিজ’ বলা হয়। বিজ অর্থ সাদা বা আলোকিত। যেহেতু এই তিন দিনের রজনীগুলো ফুটফুটে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত থাকে। তাই এগুলোকে ‘আইয়ামে বিজ’ বলা হয়। হজরত আবু জর গিফারি (রা.) বর্ণনা করেন, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে এভাবে বলেছেন, ‘হে আবু জর! যদি তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা পালন করতে চাও, তাহলে (প্রতি চাঁদের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে তা পালন করো।’ -সুনানে তিরমিজি : ৭৬১

১৮.সপ্তাহে কোন কোন দিন রোজা রাখা নিষেধ :

ইসলামের পঞ্চভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিত্তি রোজা। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার উপর অন্যতম মৌলিক ফরজ। তার আনুগত্যে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমরা রমজান মাসে সে ফরজ আদায় করি।

এছাড়া বাকি মাসগুলোতে নফল, ওয়াজিব ও অন্যান্য রোজা আদায় করা যায়। তবে বছরের এমন পাঁচটি দিন রয়েছে, যে দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ। দিনগুলো হলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দুই দিন এবং ঈদুল আজহার পরের আইয়েমে তাশরিকের তিন দিন তথা এগারো জিলহজ থেকে তেরো জিলহজ পর্যন্ত। হাদিসে পাকে এ দিনগুলোতে রোজা রাখতে রাসুল সা. নিষেধ করছেন। কতক হাদিসে রোজা না-রাখার কারণ স্পষ্ট কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের দুই দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরিফ; হাদিস: ১১৩৮।

এমনিভাবে অসংখ্য হাদিসে ঈদুল আজহার পরবর্তী আইয়্যেমে তাশরিকের তিনদিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু দাউদের এক হাদিসে এসেছে, হযরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, আরাফার দিন, ঈদুল আজহার দিন ও আইয়্যেমে তাশরিকের দিনগুলো আমাদের মুসলমানদের ঈদের দিন। এবং তা পানাহারের দিন। আবু দাউদ;

■ যে পাঁচ দিন কোনো ধরনের রোজা রাখাই জায়েজ নয়, তা হলো—

১. শাওয়ালের ১ তারিখ তথা ঈদুল ফিতরের দিন।

২. জিলহজের ১০ তারিখ তথা দুল আজহার দিন।

৩. জিলহজের ১১ তারিখ তথা আইয়ামে তাশরিকের প্রথম দিন।

৪. জিলহজের ১২ তারিখ তথা আইয়ামে তাশরিকের দ্বিতীয় দিন।

৫. জিলহজের ১৩ তারিখ তথা আইয়ামে তাশরিকের তৃতীয় দিন।

সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, ‘নবী (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।’ (বুখারি: ১৯৯২; মুসলিম: ৮২৭) আরেকটি হাদিসে আবু উবাইদা (রা.) বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করেছি। তিনি বলেছেন, ‘এ দুই দিনের রোজা রাখতে নবী (সা.) নিষেধ করেছেন। প্রথম দিন হলো, যখন তোমরা রোজা শেষ করো; আর দ্বিতীয় দিন হলো, যখন তোমরা কোরবানির মাংস খাবে।’ (বুখারি: ১৮৫১)

একইভাবে তাশরিকের তিন দিনও রোজা রাখা হারাম হওয়ার বিষয়টি হাদিস থেকে প্রমাণিত। মহানবী (সা.) বলেন, 'তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।' (মুসলিম: ১১৪১)

এই সব হাদিস থেকে এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত পাঁচ দিনে রোজা রাখা হারাম।

১৯.বৃহস্পতিবার রোজা রাখার ৭ ফজিলত :

বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তাহের দুটি দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখতেন।

এ ব্যাপারে তিনি (সা.) বলেছেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন দুটি এমন, যে দিন দুটিতে বান্দার আমলগুলো মহান আল্লাহর সামনে হাজির করা হয়। আর আমি রোজা থাকা অবস্থায় আমার আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হোক- এটাই আমি পছন্দ করি'।

(মুসলিম)

সোম ও বৃহস্পতিবার; এ দুদিন রোজা রাখার ৭টি ফজিলত উল্লেখ করা হলো-

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। হাদিসে কুদসিতে মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'রোজা আমার এবং আমিই এর প্রতিদান দেব'।

২. রাসূল (সা.) এর অনুসরণ। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোজার অপেক্ষা করতেন'।

(ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, নাসাঈ)

৩. আল্লাহ তাআলা বান্দা থেকে জাহান্নামকে ১০০ বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে তার থেকে ১০০ বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন'। (আস সিলসিলাতুস সহিহাহ: খন্ড-৬, হাদিস নম্বর: ২৫৬৫)।

৪. আল্লাহ তাআলা বান্দা এবং জাহান্নামের মাঝে আসমান ও জমিনের দূরত্ব সমান খন্দক তৈরি করে রাখেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার এবং জাহান্নামের মাঝে আসমান ও জমিনের দূরত্ব সমপরিমাণ খন্দক তৈরি করে দেবেন'। (আস সিলসিলাতুস সহিহাহ: খন্ড-২, হাদিস নম্বর: ৫৬৩)

৫. রোজা কেয়ামতের দিন বান্দার মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'রোজা এবং কোরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা আল্লাহ তাআলাকে বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে আহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রেখেছিলাম সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে রেখেছিলাম, এজন্য তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর। রাসূল (সা.) বলেন, তখন উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে'। (আহমদ: খন্ড-২, হাদিস নম্বর: ১৭৪)

৬. কেয়ামতের দিন বাবুর রাইয়ান দিয়ে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে। রাসূল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয় জান্নাতের রাইয়ান নামের একটি দরজা আছে, কেয়ামতের দিন সেখান দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে'। (বুখারি: হাদিস নম্বর: ১৮৯৬, মুসলিম: হাদদি নম্বর: ১১৫২)

৭. রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল করার সম্ভাবনা এবং জান্নাত লাভ। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’। (সহিহ আল জামে: হাদিস নম্বর: ৬২২৪)

২০.রোজা না রাখার ভয়াবহ শাস্তি

রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের ওপর রমজানের রোজা ফরজ করেছেন।পূর্ববর্তী উম্মতের ওপরও রোজা ফরজ ছিল। রোজার সুফল হলো এর মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি লাভ হয়।পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা, তোমাদের ওপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যেন তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩)

রোজা ইসলামের স্তম্ভ : রাসুলুল্লাহ (সা.) রোজাকে ইসলামের স্তম্ভ ঘোষণা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; নামাজ কায়েম করা; জাকাত আদায় করা; আল্লাহর ঘরের হজ করা এবং রমজানের রোজা রাখা।(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮)

রোজা ত্যাগ করা কবিরা গুনাহ : শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া রোজা ত্যাগ করা কবিরা গুনাহ। কেননা আল্লাহর নির্দেশ হলো, ‘রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের

মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোজা পালন করে। কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া রোজা ত্যাগ করল সে ইসলামের রোকন ও ফরজ বিধান ত্যাগ করল, সে কবিরা গুনাহ করল। একটি কবিরা গুনাহই মানুষের জাহান্নামি হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

রোজা না রাখার ভয়াবহতা

রমজানে রোজা না রাখার যেসব শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি ভয়াবহ দিক হলো :

১. কুফরিসদৃশ কাজ : শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়াই যারা রমজানের রোজা ত্যাগ করে তারা কুফরিসদৃশ কাজ করে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ইসলামের হাতল ও দ্বিনের মূল বিষয় তিনটি; যার ওপর ইসলামের ভিত্তি। যে ব্যক্তি তার একটি ত্যাগ করল, সে এমন অবিশ্বাসীতে পরিণত হলো, যার রক্তপাত বৈধ। সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই বলে সাক্ষ্য দেওয়া, ফরজ নামাজ ও রমজানের রোজা। ' (মাজমাউল জাওয়াইদ : ১/৪৮)

২. মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে সংশয় : ইমাম জাহাবি (রহ.) মুমিনদের কাছে এ কথা প্রমাণিত, যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থতা ও শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া রোজা ছেড়ে দেয় সে মদ্যপ ও ব্যভিচারকারীর চেয়েও নিকৃষ্ট; বরং তারা তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ করে এবং তাকে জিন্দিক তথা ধর্মদ্রোহী বলে সন্দেহ করে। (আল-কাবায়ির, পৃষ্ঠা ৬৪)

৩. জাহান্নামে ভয়াবহ শাস্তি : আবু উমামা বাহিলি (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় দুজন মানুষ এসে আমার দুই বাহু ধরে

আমাকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে তারা আমাকে বলল, পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য সহজ করে দিচ্ছি। তাদের আশ্বাস পেয়ে আমি উঠতে লাগলাম এবং পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত গেলাম। সেখানে প্রচণ্ড চিৎকারে শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বলল, এটা জাহান্নামিদের চিৎকার। এরপর তারা আমাকে এমন কিছু লোকের কাছে নিয়ে গেল যাদের পায়ের টাকনুতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল ছিন্নভিন্ন এবং তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা হচ্ছে এমন রোজাদার যারা রোজা পূর্ণ করার আগে ইফতার করত। ' (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৭৪৯১)

রোজা ভাঙার প্রতিবিধান : প্রকৃতপক্ষে ফরজ আমল সময়মতো পালন না করার কোনো পরিপূর্ণ প্রতিবিধান নেই। কেননা ব্যক্তি সময়মতো ইবাদত না করলে যে ফজিলত ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয় তা কখনো ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। হাদিসে এমনটিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি প্রয়োজন ও রোগ ছাড়া রমজানের একটি রোজা ভেঙে ফেলল, তার সারা জীবনের রোজা দ্বারাও এ কাজা আদায় হবে না, যদিও সে সারা জীবন রোজা পালন করে। ' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৭২৩)

তবে ফকিহ আলেমরা বলেন, ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ত্যাগ করে তবু তার প্রতিবিধান আছে। এই প্রতিবিধান তাঁর পাপমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। তারা বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি রমজানের যত রোজা ছুটে গেছে তার জন্য তওবা করবে এবং আনুমানিক হিসাব করে তার কাজা আদায় করতে হবে। কাজা লাগাতার করা আবশ্যক নয়। বার্ধক্য বা কোনো কারণে কাজা না করতে পারলে ফিদিয়া দেবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃত

যত রোজা রেখে নষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেক রোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ৬০টি করে রোজা কাফফারা হিসেবে রাখতে হবে। রোজা রাখার সামর্থ্য না থাকলে প্রত্যেক রোজার জন্য এক ফিতরা পরিমাণ কাফফারা দেবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২০৫, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ২/৪৬৪)

২১. বিনা ওজোরে রোজা ত্যাগ করার সাজা :

দিন মূলেই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা এবং যারা পূর্ণ মাসই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা যে কত করুণ, কত সঙ্গিন তা অনুমেয়!

মুস্তাফা মুহাম্মাদ আম্মারাহ তাঁর তারগীবের টীকায়[2] বলেন, 'উক্ত হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে রোযা ভঙ্গকারীদের আযাব সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করেছেন। তিনি দেখেছেন, তাদের সেই দুরবস্থা; তাদের আকার-আকৃতি ছিল বড় মর্মান্তিক ও নিকৃষ্ট। কঠিন যন্ত্রণায় তারা কুকুর ও নেকড়ের মত চিৎকার করছে। তারা সাহায্য প্রার্থনা করছে অথচ কোন সাহায্যকারী নেই। তাদের পায়ের শেষ প্রান্তে (গোড়ালির উপর মোটা শিরায়) জাহান্নামের আঁকুশি দিয়ে কসাইখানার যবাই করা ছাগলের মত তাদেরকে নিম্নমুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তাদের কশ বেয়ে মুখভর্তি রক্ত ঝরছে! আশা করি নাফরমান বেরোযাদার মুসলিম সম্প্রদায় এই আযাবের কথা জেনে আল্লাহর নিকট তওবা করবে এবং তাঁর সেই আযাবকে ভয় করে যথানিয়মে রোযা পালন করবে।'

ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন, 'মুমিনদের নিকটে এ কথা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ ও ওজর না থাকা সত্ত্বেও রমাযানের রোযা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি একজন ব্যভিচারী ও

মদ্যপায়ী থেকেও নিকৃষ্ট। বরং মুসলিমরা তার ইসলামে সন্দেহ পোষণ করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন নাস্তিক ও নৈতিক শৈথিল্যপূর্ণ মানুষ।

উদাসীনতায় রমজান পার...

আমরা অনেকেই শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হেলাফেলায় রোজা ভেঙে ফেলি। যা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ গুনাহের কাজ। বেরোজাদারের জন্য রমজান মাসে রেস্তোরাঁ ও রাস্তার পাশের খাবারের দোকানগুলো পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। তারা সেখানে বাহারি পদের খাবার আর চা, সিগারেটের আড্ডায় মেতে ওঠে।

উদাসীনতায় পার করে দেয় রমজান, বঞ্চিত হয় অঢেল ফজিলত থেকে। মানুষের লজ্জায় তারা পর্দার আড়ালে খাবার খায়। কিন্তু যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রাজাধিরাজ, বিচার দিনের অধিপতি, তার ভয় তাদের অন্তরে থাকে না। তারা ভুলে যায় আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে অবগত; হোক তা পর্দার আড়ালে কিংবা প্রকাশ্যে। মহান আল্লাহ আমাদের সব বিষয় সম্পর্কে অবগত।

২২.রোজা রাখার পুরস্কার কি :

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতকে রমজান মাসে পাঁচটি জিনিস বিশেষভাবে দান করা হয়েছে, যা আগের (কোনো নবির) উম্মতকে দেওয়া হয়নি। তাহলো-

১. রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের থেকে বেশি প্রিয়।

২. ফেরেশতারা তাদের (রোজাদারের) জন্য ইফতার পর্যন্ত ক্ষমার দোয়া করতে থাকে।

৩. তাদের (রোজাদারের) জন্য প্রতিদিন জান্নাতকে সাজানো হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- অতিসত্বরই আমার নেক বান্দারা কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে আসবে।

৪. এ (রমজান) মাসে দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। যার কারণে অন্যান্য মাসের মতো এই মাসে খারাপ কাজ সংঘঠিত হয় না।

৫. রমজানের সর্বশেষ রাতে রোজাদারকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- 'হে আল্লাহর রাসুল! সেই রাত কি লাইলাতুল কদর?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, 'না', বরং নিয়ম হলো- কাজ শেষ হলে মজদুরকে তার মজুরি দেয়া।

রোজাদারের জন্য আরও যেসব প্রতিদানের কথা ঘোষণা করেছেন নবিজি, তা তুলে ধরা হলো-

১. রোজাদারের প্রতিদান দেবেন আল্লাহআল্লাহ তাআলা নিজ হাতে রোজাদারের প্রতিদান দেবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'বনি আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই। শুধু রোজা ছাড়া; তা আমার জন্য। আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব।' (বুখারি ৫৯২৭)

২. রোজাদারের জন্য রয়েছে জান্নাতে বিশেষ দরজারোজাদারের জন্য জান্নাতে থাকবে বিশেষ দরজা। যে দরজা দিয়ে শুধু রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতের একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন ওই দরজা দিয়ে রোজা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ওই দরজা দিয়ে

প্রবেশ করবে না। রোজা পালনকারীরা প্রবেশ করলে দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সেই দরজা দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।' (বুখারি ১৮৯৬)

৩. রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ মিশক আম্বরের চেয়ে প্রিয়রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিশক আম্বরের চেয়েও অধিক প্রিয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ওই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, রোজা পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তাআলার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকে বেশি পছন্দনীয়। (নাসাঈ ২২১৩)

৪. রোজাদারের আনন্দঘন দুটি মুহূর্তরোজাদারের জন্য আনন্দময় দুটি মুহূর্ত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'রোজা পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি হলো, যখন সে ইফতার করে, তখন আনন্দিত হয়; অপরটি হলো, যখন সে মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে আনন্দিত হবে।' (মুসলিম ২৫৯৮)

৫. শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে রোজাদাররোজাদার শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। রোজাদারের জন্য রমজান মাসের রোজা ঢালস্বরূপ। রোজা রাখলে শয়তান রোজাদারকে আক্রমণ করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'রোজা (সব ধরনের অশ্লিল ও মন্দ কাজের) ঢালস্বরূপ।' (বুখারি ১৯০৪)

৬. রোজা সুপারিশকারীকেয়ামতের দিন রোজাদারের জন্য সুপারিশ করবে রোজা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন রোজা এবং কোরআন রোজাদার ও তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।' রোজা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আর কোরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং

তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'অতএব, এদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।' (মুসনাদে আহমদ ৬৬২৬)

৭. বিগত জীবনের সব গুনাহ ক্ষমা হবে রোজায়রোজা রাখার মাধ্যমে আগের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমজানে রোজা পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করা হবে।' (বুখারি ১৯০১)

২৩.রোজা অবস্থায় হায়েজ শুরু বা শেষ হলে করণীয় কি :

সিয়ামরত অবস্থায় হায়েজ বা ঋতুস্রাব শুরু হলে রোজা ছেড়ে দেবে। আর রোজার সঙ্গে যাতে মিলে না যায়, তাই উচিত হচ্ছে– গোপনে পানাহার করা। কেননা এ অবস্থায় রোজা রাখা হারাম আর হারামের সঙ্গে মিলে যায় এমন যে কোনো কাজ করাকেও অনেক ফুকাহারা নাজায়েজ বলেছেন। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যাতে কোনো রোজারদের সামনে প্রকাশ্যে পানাহার না করা হয়।

অবশ্য রমজানের দিনেরবেলায় যদি কোনো নারীর হায়েজ/ ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি পবিত্র হয়ে যান তা হলে ওই দিনের অবশিষ্ট সময় তার জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরি। পরে ছুটে যাওয়া রোজার সঙ্গে শেষের দিনের রোজারও কাজ করতে হবে।

নারীর পিরিয়ডের ঋতুস্রাবের সময়সীমা ছয় বা সাত দিন হয়; কিন্তু মাঝেমধ্যে এ সময়সীমা বৃদ্ধি হয়ে আট, নয়, দশ অথবা এগারো দিনে গড়ায়, তা হলে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নামাজ আদায় ও রোজা রাখতে পারবেন না। (সুরা বাকারা : ২২২)

পিরিয়ডের রক্ত থাকাকালীন নারী আপন অবস্থায় থাকবে, তারপর ভালো হয়ে গেলে গোসল করে নামাজ ও রোজা আদায় করতে পারবে।

রোজা পালনকারী নারীর যদি সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগেও পিরিয়ড দেখা দেয়, তা হলে তার ওই দিনের রোজা বাতিল হয়ে যাবে। পরে রোজাটি কাজা করতে হবে।

যদি রমজানের রাতে সুবহে সাদিক হওয়ার সামান্য আগেও কোনো নারী পিরিয়ড থেকে পবিত্র হন, তবে তার ওপর রোজা পালন আবশ্যক। কারণ তিনি রোজা পালনে সক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত। তার রোজাপালনে এখন কোনো অন্তরায় না থাকায় রোজা পালন ওয়াজিব।

এক্ষেত্রে তিনি পবিত্র হওয়ার গোসল সুবহে সাদিকের পর করলেও রোজা শুদ্ধ হবে। যেমন গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর গোসল করলে তার রোজা শুদ্ধ হয়।

আধুনিক যুগে ওষুধ খেয়ে পিরিয়ড সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা যায়। কোনো নারী যদি ওষুধ খেয়ে রোজা রাখতে চান, তা হলে তার রোজা হয়ে যাবে। তবে প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যত্যয় ঘটানো অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। তাই আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী চলা এবং ওষুধ গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

সূত্র: (হেদায়া ১/২২৫; কিফায়া ৩/২৮৩; ফাতহুল বারি ২/২৮২; হাশিয়াতুত ত্বহত্বী আলা মারাকিল ফালাহ পৃ.৩৭০; আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৪২০)

২৪.মহিলাদের রোজাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু মাসালা :

মাসয়ালা : রমজান মাসে মহিলাদের পিরিয়ডের রোজা না রাখলে অথবা রোজা রাখার পর পিরিয়ড শুরু হলে তার জন্য পানাহার করা বৈধ। তবে অন্য লোকদের সামনে পানাহার করা উচিত নয়।

দিনের বেলায় যদি ঋতু বন্ধ হয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তাহলে দিনের বাকি অংশে রোজাদারের মতো পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করা ওয়াজিব। -আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৪২০

এ প্রসঙ্গে হাদিসে আছে, উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হায়েজ থেকে পবিত্রতার পর মহিলারা কি নামাজ ও রোজার কাজা আদায় করবে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় আমাদের রোজার কাজা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নামাজের নয়।

রোজা কাজা করা আর নামাজ কাজা না করা সম্পর্কে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) যা বলেছেন সমস্ত উলামায়ে কেরাম তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন অর্থাৎ ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাসয়ালা : হায়েজ (মাসিক পিরিয়ড), নেফাসের (প্রসব পরবর্তী স্রাব) সময়গুলোতে রোজা রাখা নিষেধ, তবে পরবর্তীতে এ দিনগুলোর রোজার কাজা করতে হবে।

মাসয়ালা : পবিত্র অবস্থায় রোজা রাখার পর যদি হায়েজ শুরু হয় বা সন্তান প্রসব হয়, তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং পরে তা কাজা করতে হবে। চাই সেটা ফরজ বা নফল রোজা হোক।

মাসয়ালা : রমজান মাসে সুবহে সাদেকের পর যদি কোনো মহিলার হায়েজ, নেফাস বন্ধ হয়ে যায় এবং সে এই সময়ের মধ্যে কোনো কিছু পানাহার না করে এমতাবস্থয় যদি সে রোজার নিয়ত করে তাহলে ওই দিনের রোজা শুদ্ধ হবে না ববং পরবর্তীতে উক্ত রোজার কাজা করতে হবে, কারণ সে দিনের শুরুলগ্নে অপবিত্র ছিল।

মাসয়ালা : যদি কেউ পূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত পর, রাতের শেষভাগে গিয়ে পবিত্র হয় এবং তখন রাতের এতটুকু সময়ও হাতে নেই যার মধ্যে একবার আল্লাহু আকবার বলতে পারে।

তবুও পরের দিনের রোজা ওয়াজিব। আর যদি ১০ দিনের কমে হায়েজ বন্ধ হয় এবং এতটুকু রাত অবশিষ্ট থাকে, যার মধ্যে তাড়াহুড়া করে গোসল করে নিতে পারে তবে ১ বারও আল্লাহু আকবার বলা যায় না। তবুও পরের দিনের রোজা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় গোসল না করে থাকলে গোসল ছাড়াই রোজার নিয়ত করে নিবে, আর যদি সময় তার চেয়েও কম থাকে তাহলে রোজা হবে না, তাই সে রোজা রাখবে না। তবে সারাদিন তাকে রোজাদারের মতোই থাকতে হবে এবং পরে কাজা করতে হবে।

মাসয়ালা : হায়েজ, নেফাস অবস্থায় কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করা মুখস্থ হোক বা দেখে হোক জায়েজ নয়।

মাসয়ালা : কোনো মেয়ের হেফজ করা অবস্থায় হায়েজ এসে গেলে এবং মুখস্থ করার জন্য তেলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বা কোনো হাফেজা মেয়ের হায়েজ অবস্থায় কোরআন হেফজ করার জন্য তেলাওয়াত জারি রাখতে চাইলে মনে মনে তেলাওয়াত করবে মুখে উচ্চারণ করবে না।

মাসয়ালা : হায়েজ, নেফাসওয়ালি মহিলা বাচ্চাদেরকে কোরআন শরিফ বানান করে শিক্ষা দিতে পারবে। তবে রিডিং পড়ানোর সময় ১ শ্বাসে পূর্ণ ১ আয়াত পড়াতে পারবে না বরং শ্বাস ভেঙ্গে ভেঙ্গে ১-২ শব্দ করে পড়াতে হবে।

২৫.যেসব কারণে নারীদের রোজা কাজা করার সুযোগ আছে :

অন্তঃসত্ত্বা অথবা সন্তানকে দুধপান করাচ্ছেন এমন নারী রোজা রাখার কারণে যদি নিজেদের কষ্ট হয় অথবা তাদের শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে রোজা না রেখে যখন সহজ হবে অথবা ক্ষতির আশঙ্কা দূর হবে, তখন রোজা কাজা করে নেওয়া যায়। এর বৈধতা রয়েছে ইসলামে।

এছাড়া রোজা রাখার পর দিনের বেলা পিরিয়ড শুরু হলে নারীর রোজা ভেঙে যায়। এমন নারীর জন্য খাওয়াদাওয়া করা বৈধ।

তবে ওই দিন সম্ভব হলে রোজাদারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে পানাহার থেকে বিরত থাকবে। (ফাতাওয়া হক্কানিয়া : ৪/১৯০)

কোনো নারীর যদি ফজরের আগেই পিরিয়ড শুরু হয়ে যায়, ওই নারীর জন্য দিনের বেলা খাওয়াদাওয়া করা বৈধ।

তবে গোপনে পানাহার করা উচিত। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৪২৮)

পিরিয়ডের কারণে রোজা না রেখে দিন শুরু করার পর পিরিয়ড বন্ধ হলে দিনের বাকি অংশ রোজাদারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে পানাহার বর্জন করবে।

কিন্তু এ দিনের রোজাও পরে কাজা করে নিতে হবে।

(আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৪২৮), বাহ্রুর রায়েক : ২/২৯১)

এ প্রসঙ্গে হাদিসে আছে, উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হায়েজ থেকে পবিত্রতার পর মহিলারা কি নামাজ ও রোজার কাজা আদায় করবে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় আমাদের রোজার কাজা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নামাজের নয়। ' -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

রোজা অবস্থায় শিশুকে দুধ পান করালে রোজা ভঙ্গ হয় না। (ফাতাওয়া দারুল উলুম : ৬/৪০৮)

রমজান মাসে রাতে গোসল ফরজ হলে গোসল না করেও দিনে রোজা রাখা বৈধ। গোসল না করায় রোজার ক্ষতি হবে না। তবে ফরজ গোসলে বিলম্ব করা অনুচিত।

নারী যদি নিজের অভ্যাস অনুযায়ী বুঝতে পারে যে আগামীকাল তার মাসিক শুরু হবে, তবু সে রোজা ভাঙবে না, যতক্ষণ না সে তার পিরিয়ডের রক্ত দেখতে পায়। (আপকে মাসায়েল : খ. ৩, পৃ. ২৭৮)

ঋতুমতী নারীর জন্য উত্তম হলো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা এবং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। ওষুধ ব্যবহার করে রক্ত বন্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। কেননা ইসলামের মহীয়সী সব নারী এমনটিই করেছেন। তবে যদি ওষুধ দিয়ে রক্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে রোজা রাখা যাবে এবং রোজা হয়ে যাবে।

(আপকে মাসায়েল : খণ্ড ৩, পৃ. ২০৭)

তিন থেকে ১০ দিন পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে মাসিক ঋতুস্রাবকালীন নামাজ-রোজা বন্ধ রাখবে। কোনো কারণে ঋতুস্রাবের সময় ১০ দিনের চেয়ে বেড়ে গেলে নিজের আগের অভ্যাস অনুপাতে যে মেয়াদ আছে, ওই দিন পর্যন্ত বন্ধ রেখে এর পর থেকে নামাজ-রোজা পালন করবে।

আর যদি ১০ দিনের ভেতরই শেষ হয়ে যায়, তাহলে রক্ত আসার শেষ দিন পর্যন্ত ঋতুস্রাব গণ্য করে নামাজ, রোজা ইত্যাদি বন্ধ রাখবে। (আদ্দুররুল মুখতার : ১/৩০০-৩০১)

অনেক নারী রোজা পালনের সুবিধার্থে ওষুধ খেয়ে স্রাব বন্ধ রাখেন। এতে যদি শারীরিক ক্ষতি না হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

নারীদের অপবিত্র থাকার সময়ে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কোরআন তিলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ, যেভাবে তা অপবিত্র পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু তারা বিভিন্ন দোয়া-দরুদ, তাসবিহ-তাহলিল ও জিকির-আজকার করতে পারবে। এমনকি দোয়া হিসেবে আয়াতুল কুরসি ও কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করা যাবে। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে, নিরাপত্তাও লাভ হবে।

২৬.রোজা নিয়ে ২০ ভুল ধারণা :

১. রমজানের চাঁদ না দেখা।

২. রোজার জন্য শুধু খাবার মজুদ করা।

৩. বাচ্চাদের রোজা রাখতে না দেয়া।

৪. মুখের নিয়তকে জরুরি মনে করা।

৫. রোজা রেখেও পাপ কাজ করা।

৬. মিসওয়াক করাকে দোষের মনে করা।

৭. সেহরি বেশি দ্রুত বা বেশি দেরি করে খাওয়া।

৮. গোসল ফরজ হলে সেহরি খাওয়াকে দোষের মনে করা।

৯. সেহরি না খেলে রোজা হয় না মনে করা।

১০. সেহরিতে খেজুর না খাওয়া।

১১. সেহরিতে দোয়া না করা।

১২. থুতু গিললে রোজা ভেঙে গেছে মনে করা।

১৩. ফজর পড়ে ঘুমানো।

১৪. মাগরিবের আজানের জবাব না দেয়া।

১৫. তারাবির নামাজে তাড়াহুড়ো ও চার রাকাত পরপর দোয়াকে জরুরি মনে করা।

১৬. রোজা রেখে সময় অপচয় করা।

১৭. ইফতারদাতার জন্য দোয়া না করা।

১৮. ইতেকাফ না করা।

১৯. রোজার শেষ দিন কেনাকাটায় বেশি ব্যস্ত হওয়া।

২০. ফিতরা সময়মতো আদায় না করা

মাহে রমজানের প্রতিটি মুহূর্ত মুমিন-জীবনের জন্য অনেক মহামূল্যবান। প্রতিটি দিন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে মাহে রমজানের শেষ ১০ দিনের তাৎপর্য অপরিসীম।

নবীজি (সা.) এবং তার সাহাবীরা এই দিনগুলোকে খুব গুরুত্ব দিতেন। রমজানের অন্যান্য দিনে যেই আমলগুলো করতেন, শেষ ১০ দিনে এসে তার পরিমাণ অনেক বেড়ে যেত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রমজানের শেষ ১০ দিনে নবীজি (সা.) ইবাদতের জন্য লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে ফেলতেন। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। সারা রাত জেগে থেকে ইবাদত করতেন এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

২৭.রমজানের শেষ ১০ দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আমল:

ইতেকাফ: লাইলাতুল কদরের কল্যাণ যেন আমাদের ছুঁয়ে যায়, তাই নবীজি (সা.) রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতেকাফের আমল দিয়েছেন। গুরুত্বের সঙ্গে অন্যকেও আমল করে শিখিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, 'নবীজি রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতেকাফ করতেন।' (বুখারি, হাদিস: ২০২৫)

আয়েশা (রা.) বলেন, 'নবীজি শেষ ১০ দিনে ইতেকাফ করতেন, আর বলতেন- তোমরা এই সময়ে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।' (বুখারি, হাদিস: ২০২০)

তিনি আরও বলেন, নবীজি তার ইন্তেকাল পর্যন্ত এই সময়টাতে ইতেকাফ করেছেন, তারপর তাঁর স্ত্রীরাও ইতেকাফ করেছেন। (বুখারি, হাদিস: ২০২৬)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবীজি ওফাতের বছরে ২০ দিন ইতেকাফ করেন। (বুখারি, হাদিস: ২০৪৪)

শবে কদরের খোঁজ: শেষ ১০ দিনে ইবাদতের অন্যতম হলো— শবে কদর তালাশ করা। নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শবে কদরের সন্ধান পেতে চায় সে যেন রমজানের শেষ ১০ দশকে খুঁজে নেয়।' (বুখারি, হাদিস: ১১৫৮)

নবীজি (সা.) আরও বলেছেন, 'তোমরা রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের তালাশ করো।' (বুখারি, হাদিস: ২০১৭)

অন্য হাদিসে বলেন, 'একটি রাত হাজার রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যে এর কল্যাণ অর্জন করতে পারে না— তার সকল কল্যাণই হাতছাড়া হয়। সত্যিকার হতভাগা ছাড়া কেউ এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না।' (ইবনু মাজাহ, হাদিস: ১৬৪৪)

আয়েশা (রা.) নবীজিকে বলেন, যদি আমি শবে কদর পেয়ে যাই— তাহলে কী দোয়া করবো? নবীজি শেখালেন এই দোয়া— 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওবুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নি। অর্থাৎ: 'হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাকারী, ক্ষমা করতে আপনি পছন্দ করেন। অতএব আমায় ক্ষমা করুন।' (তিরমিজি, হাদিস:

আয়েশা (রা.) নবীজিকে বলেন, যদি আমি শবে কদর পেয়ে যাই— তাহলে কী দোয়া করবো? নবীজি শেখালেন এই দোয়া— 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওবুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নি। অর্থাৎ: 'হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাকারী, ক্ষমা করতে আপনি পছন্দ করেন। অতএব আমায় ক্ষমা করুন।' (তিরমিজি, হাদিস: ৩৫১৩)

সদকাতুল ফিতর আদায়: এই সময়ের অন্যতম আমল সদকাতুল ফিতর আদায় করা। সামর্থ্যবান প্রতিটি নারী-পুরুষ ছোট-বড় সবার জন্য রাসুল (সা.) এটা ফরজ করেছেন। সেই

সঙ্গে নির্দেশ করেছেন— যেন তা ঈদুল ফিতরের নামাজের পূর্বেই আদায় করা হয়। (বুখারি, হাদিস: ১৫০৩)

সদকাতুল ফিতর আদায়: এই সময়ের অন্যতম আমল সদকাতুল ফিতর আদায় করা। সামর্থ্যবান প্রতিটি নারী-পুরুষ ছোট-বড় সবার জন্য রাসুল (সা.) এটা ফরজ করেছেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ করেছেন— যেন তা ঈদুল ফিতরের নামাজের পূর্বেই আদায় করা হয়। (বুখারি, হাদিস: ১৫০৩)

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, ‘নবীজি সদকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন— যাতে করে এটা রোজাদারের রোজার বিচ্যুতি তথা অনর্থক কথা-কাজ ও অশালীন আচরণের ক্ষতিপূরণ হয় এবং অসহায় মানুষের খাবারের সুন্দর ব্যবস্থা হয়।’ (আবু দাউদ, হাদিস: ১৬০৯)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, ‘নবীজির যুগে আমরা ঈদুল ফিতরের দিনে খাদ্যদ্রব্যের এক সা’ অথবা এক সা’ যব, অথবা এক সা’ খেজুর, অথবা এক সা’ পনির অথবা এক সা’ কিশমিশ সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।’ (বুখারি, হাদিস: ১৫০৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সময়ের মূল্য বুঝে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

✿ ✿ ✿ সমাপ্ত ✿ ✿ ✿